KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher আতাউর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ২১/১ ২১/2 ২১/৩ ২১/৪	Year of Publication : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৫ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫ কার্তিক-পৌষ ১৩৫৫ মাঘ-চৈত্র ১৩৫৫
	Condition : Brittle : Good
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির সম্পাদিত

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

১৮৬৭
খৃষ্টাব্দ
হইতে
ভারতের সেবায়
নিয়োজিত

বামার লরী

কলিকাতা • বোম্বাই • নিউ দিল্লী • আসানসোল

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ ১১১
শামসুর রাহমান ॥ ব্যবধান ১১৮
আনন্দ বাগচী ॥ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ১১৯
রাম বসু ॥ দুটি দেবদারু ও পাঁচটি পায়রা ১২০
গোবিন্দ চক্রবর্তী ॥ সোনার পদ্ম ১২১
তরুণ সান্যাল ॥ স্মৃতি ১২২
শিবশম্ভু পাল ॥ শিল্পীর জন্য শোক ১২৩
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন ১২৪
মনীশ ঘটক ॥ কনখল ১৪০
অতীন্দ্রনাথ বসু ॥ নৈরাজ্যবাদ : প্রজ্ঞানযুগ ১৭২
চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ ল্যাটিন কবিতার অনুবাদ ১৮৯
হরপ্রসাদ মিত্র ॥ আধুনিক সাহিত্য ২০৯
সমালোচনা—হীরণকুমার সান্যাল, লীলা মজুমদার,
জীবেন্দ্র সিংহরায়, আনন্দ বাগচী ২১৩

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫এ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

একবিংশতিতম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

চতুরঙ্গ

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৬

সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ

হুমায়ুন কবির

প্রায় তিন বছর আগে সোভিয়েট দেশ থেকে ফিরে 'মস্কোতে পাঁচ সপ্তাহ' বলে ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ রচনার পরিকল্পনা করেছিলাম। তার প্রথম প্রবন্ধ "চতুরঙ্গে"র কার্তিক-পৌষ ১৩৬৪ সংখ্যায় প্রকাশিতও হয়েছিল। তারপর আর সে বিষয়ে লেখা এতদিন সম্ভব হয়নি। এবার আবার সোভিয়েট দেশ দেখবার সুযোগ যখন এল, তখন স্থির করলাম যে পূর্বের পরিকল্পিত প্রবন্ধগুলি লিখতেই হবে। তিন বছরে সোভিয়েট দেশে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছে, নানাভাবে জনসমাজের জীবনে তা প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া সেবার মস্কোর বাইরে যেতে পারিনি, এবার অনেক বেশী দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেবার প্রধানত সোভিয়েট শিক্ষাপ্রণালী দেখতেই গিয়েছিলাম—এবার শিক্ষাপ্রণালী ছাড়াও সোভিয়েট সমাজজীবন ও সংস্কৃতির অন্যান্য অনেক দিক দেখেছি। "চতুরঙ্গে" পূর্বে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তাও আবার পড়লাম। তাতে বিশেষ কোন পরিবর্তন করার বোধ হয় প্রয়োজন নেই, তবে সেবারের তুলনায় এবার মনে হল যে জনসাধারণের মধ্যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অনেকখানি বেড়েছে।

পূর্বের প্রবন্ধে লিখেছিলাম যে শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার ও সম্প্রসারণই সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রগতির মুখ্য কারণ। এবার ঘুরে এসে আমার সে বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, শিক্ষার প্রসার কেবল সোভিয়েট বলে নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রগতির মূলে। নৈসর্গিক সম্পদে ভারতবর্ষের মতন সমৃদ্ধ দেশ পৃথিবীতে বেশী নেই। প্রকৃতি অজস্র ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিয়েছে, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং এসিয়ায়; আরো এমন অনেক দেশের কথা সহজেই মনে আসে, কিন্তু প্রকৃতির এত পক্ষপাত সত্ত্বেও সে সমস্ত দেশ বহুক্ষেত্রেই রাষ্ট্রশক্তিতে দুর্বল, শিল্প-বাণিজ্যে অনগ্রসর, এমনকি কৃষিজাত শস্যসম্পদেও পরমুখাপেক্ষী। ভারতবর্ষে শতকরা ৭০/৭৫ জন লোক কৃষিনির্ভর হয়েও বিদেশী শস্য আমদানী না করলে আমাদের চলে না। সে তুলনায় এসিয়ায় জাপান বা ইয়োরোপে অনেক দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে হীন হয়েও সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে মানব সমাজে বরণীয়। শিক্ষার প্রসারের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। এ কথা

বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, যে দেশে শিক্ষা যত বেশী ছড়িয়ে পড়েছে, কৃষি শিল্প বাণিজ্যে সামরিক শক্তিতে ও অর্থসম্পদে সে দেশ তত অগ্রণী।

সোভিয়েট বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ এ কথা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। তাই গত চল্লিশ বৎসর ধরে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষের জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রে চেষ্টার বিরাম নেই। মস্কো সহরের উপকণ্ঠে টিলার উপর মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে বিরাট ইমারত সম্প্রতি তৈরী হয়েছে, সমস্ত সহরে বোধ হয় তার তুলনা নেই। গতবার যখন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম অংগ রুশ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী মিষ্টার আফানসেনকোর সংগে আলোচনা হয়, তিনি গর্বের সংগে বলেছিলেন যে মস্কো ইউনিভার্সিটির দালানের অবস্থান ও আয়তন দেখলেই সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিক্ষার মর্যাদা বোঝা যাবে। মহানগরীর শ্রেষ্ঠতম ইমারত বিশ্ববিদ্যালয়, সোভিয়েট জনগণের জীবনের সবচেয়ে বেশী গৌরবের জিনিস রাষ্ট্রব্যবস্থায় শিক্ষার স্থান।

পাশ্চাত্য জগতে সমস্ত দেশেই শিক্ষার মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়েছে। বিলেতে ১৯৪৯ সালের অর্থবিপর্যয়ের সময়ে লেবার পার্টির শিক্ষামন্ত্রী টমলিনসন সাহেব সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে সরকারের অন্যান্য সমস্ত খরচ কমানো যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষাবাজেটে এক পেনী কমানো হবে না, কারণ শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যবস্থা তাকে ব্যয় বলা উচিত নয়,—জাতির ভবিষ্যতকে সুনিশ্চিত করবার জন্য জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার বললেই শিক্ষা বাজেটের ঠিক বিবরণ দেওয়া হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষের জন্য যে প্রয়াস, তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফরাসী দেশে, জার্মানীতেও ঠিক একই মনোভাব। প্রাচ্য জগতে জাপানও শিক্ষার মাহাত্ম্য পুরোপুরি মানে। এ সমস্ত উন্নত দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর বলে হয়তো সোভিয়েট রাষ্ট্র এ বিষয়ে আরো বেশী মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেছে, কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন, এ সব দেশের তুলনায় বোধ হয় সোভিয়েট রাষ্ট্র শিক্ষার ব্যাপারে বেশী আগ্রহশীল।

শিক্ষা এবং ট্রেনিংয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অনুরাগ এবং প্রত্যয় না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতারা বোধ হয় মনে করেন যে শিক্ষা এবং ট্রেনিং দিয়ে মানুষের সমস্ত বৃত্তিরই বিষয়কর পরিবর্তন আনা সম্ভব। বাঙলাদেশে প্রবাদ আছে যে গাধা পিটে ঘোড়া হয় না—সোভিয়েট শিক্ষাপ্রণালীর অন্যতম লক্ষ্য যে সেই অসাধ্যই সাধন করতে হবে। তাই সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিক্ষা এবং ট্রেনিং প্রায় জন্ম থেকেই সুরু হয়, এবং মৃত্যুর প্রাক্কাল পর্যন্ত রাষ্ট্র নাগরিককে নানা বিষয়ে তরবিয়ত করতে থাকে।

পূর্বে যখন গিয়েছিলাম, তখন মস্কো সহরের কিণ্ডেরগার্টন দেখেছিলাম। এবার উজবেকস্থানের দুই জায়গায় সহরের বাইরে কলেকটিভ ফার্ম বা সমবেত কৃষিক্ষেত্রে কিণ্ডের-গার্টন দেখলাম। মস্কো মহানগরী বিরাট সোভিয়েট রাষ্ট্রের রাজধানী—উজবেকস্থানে গ্রামাঞ্চলের কিণ্ডেরগার্টনে তার তুলনায় আসবাবপত্র অনেক কম, কিন্তু কিণ্ডেরগার্টনের মূল স্বরূপ সকল ক্ষেত্রেই এক মনে হল। দু বছর আড়াই বছর বয়স থেকে সাত বছর বয়সের শিশুদের কিণ্ডেরগার্টনে দেখলাম। মস্কো সহরে তারা বাপ-মায়ের মরজী মাফিক আসে, কলেকটিভ ফার্মে তাদের আসা প্রায় বাধ্যতামূলক। বাপ-মা দুজনেই যেখানে ক্ষেতে খামারে বা কারখানায় কাজ করতে যায়, সেখানে শিশুদের কিণ্ডেরগার্টনে না পাঠিয়ে উপায়ই বা কি?

সকাল সাড়ে সাতটা আটটায় শিশুরা বাড়ী থেকে আসে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা আটটায়

বাড়ী ফিরে যায়। প্রাতরাশ থেকে সুরু করে সান্ধ্যভোজন পর্যন্ত সারাদিনের খাওয়া-দাওয়া তারা স্কুলেই করে, কাজেই বাড়ীর সংগে ঘনিষ্ঠতা ছাড়া তাদের অন্য বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয় না। কিণ্ডেরগার্টনে মামুলী ধরনের লেখাপড়া বা আঁক শেখানো হয় না বটে কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকা, নিজেদের জিনিসপত্র ঠিক রাখা পরস্পরের সংগে সদ্ভাব স্থাপন এসব সামাজিক ব্যবহারের প্রতি যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়। শিশুদের চিত্তবিনোদনের জন্য খেলাধূলার ব্যবস্থা রয়েছে, সকালে বিকালে তারা সবাই খানিকক্ষণ ঘুমোয়, দলবেঁধে সবাই দেশ-বিদেশের রূপকথা শোনে। সংগে সংগে সোভিয়েট রাষ্ট্র-নেতাদের জীবনী ও প্রশংসা, সোভিয়েট রাষ্ট্রের কীর্তিকল্প তাদের বলা হয়, শৈশব থেকেই রাষ্ট্র, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা তাদের মনে গেঁথে দেওয়া হয়। দরিদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের এসব কিণ্ডেরগার্টনে যে ধরনের খোরাক পোষাক খেলাধূলার সুযোগ মেলে, নিজেদের বাড়ীতে তা কোনদিনই সম্ভব হত না। অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ পরিবারের ছেলে-মেয়েরাও এ ব্যবস্থার ফলে সকলের সংগে একই ভাবে মিলেমিশে থাকবার সুযোগ পায়। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন পেশা ও বিভিন্ন স্তরের ছেলেমেয়েদের এ রকম মেলামেশার ফলে জাতীয়তাবোধ প্রবল হয়, দেশভক্তি বাড়ে, কিন্তু পারিবারিক সম্বন্ধ অনেকখানি শিথিল হয়ে পড়ে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে কিশোর ও যুবকদের মনে মাতাপিতা বা আত্মীয় স্বজনের জন্য যে প্রীতি, দেশভক্তির তুলনায় তা যে অনেক ক্ষীণ, শিশু শিক্ষা-ব্যবস্থা বোধ হয় তার অন্যতম কারণ। কেউ কেউ এ কথাও বলেন যে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এ ধরনের কিণ্ডার-গার্টেনের ব্যবস্থা হয়েছে।

সাত বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শেখানোর দিকে ঝোঁক বেশী নেই, তাছাড়া একমাত্র কলেকটিভ ফার্ম ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে সব শিশুরা কিণ্ডেরগার্টনে আসে না। সাত বছর থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা কিন্তু সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে দেওয়া হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বর্তমানে কুড়ি কোটির একটু বেশী, কাজেই প্রায় চার কোটি সাড়ে চার কোটি বালকবালিকা বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় চল্লিশ কোটি, অথচ আজো ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোটে আড়াই কোটি পৌনে তিন কোটি।

সোভিয়েট প্রাথমিক শিক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক বিষয় পড়তে হয়। এ বিষয়ে আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর সংগে সোভিয়েট শিক্ষাপ্রণালীর তফাৎ সুস্পষ্ট। আমেরিকায় প্রায় প্রথম থেকেই শিশুদের পছন্দ অপছন্দের প্রতি খেয়াল রাখা হয়, বারো তেরো বছরের শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান অথবা কোন চারুকলা শিক্ষার দিকে কমবেশী জোর দিতে পারে—কোন কোন ক্ষেত্রে দুয়েকটি বিষয় বাদও দিতে পারে। সোভিয়েট শিক্ষাপ্রণালীতে শুধু প্রাথমিক নয়, মাধ্যমিক শিক্ষায়ও এ ধরনের পছন্দ অপছন্দের স্থান নেই। নেপোলিয়ন ফরাসী দেশে যে শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল যে ফরাসী নাগরিকের কর্তব্যপালনের জন্য যা কিছু শেখা প্রয়োজন, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই বাধ্যতামূলকভাবে তা শিখতে হবে। সোভিয়েট শিক্ষা-ব্যবস্থায় নেপোলীয়নের এ নীতিকে আরো প্রসারিত করে প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষা, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, চারুশিল্প, এমনকি মার্ক্সীয় দর্শনও শেখানো হয়।

এ প্রসংগে লক্ষণীয় যে সোভিয়েট শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বয়সে বিজ্ঞানের অনুশীলন আরম্ভ হয় বোধ হয় অন্য কোন দেশে তার নজীর মেলে না। নয় বছর বয়সে শিশুদের

প্রাণবিজ্ঞান বা বায়োলজির, দশ বছর বয়সে ফিজিক্স এবং এগারো বছর বয়সে কেমিস্ট্রির পাঠ সুরু হয়। চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত যারা কেবলমাত্র বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে, মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করে না, তারাও পাঁচ বছর বায়োলজি, চার বছর ফিজিক্স এবং তিন বছর কেমিস্ট্রি পড়ে। ফলে বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। কোটি কোটি লোক বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত, বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ায় মানুষ বলেই আজ সোভিয়েট রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অসাধারণ অগ্রগতি দেখিয়েছে।

১৯৫৬ সালে যখন মস্কো গিয়েছিলাম, শুনেছিলাম যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ সাত বছর থেকে বাড়িয়ে দশ বছর করা হবে। তখন দুয়েকজন সোভিয়েট শিক্ষাবিদ গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ মোটে ষোল বছর বয়সে শেষ হয়ে যায়, কাজেই সাত থেকে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত নাগরিকের শিক্ষার ব্যবস্থা করে সোভিয়েট রাষ্ট্র পৃথিবীতে এক নতুন আদর্শ স্থাপন করবে। তখন এ কথাও শুনেছিলাম যে দশ বৎসরের এ নতুন বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা মস্কো লেনিনগ্রাদ প্রভৃতি বড় সহরে চালু হয়ে গিয়েছে, এবং ১৯৬০ সালের মধ্যে সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে তা ছড়িয়ে পড়বে।

এখন বোঝা যাচ্ছে যে এ পরিকল্পনা কেবলমাত্র পরিকল্পনাই রয়ে গেছে, বাস্তবে পরিণত হয়নি। কয়েক মাস আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে সাত থেকে চোদ্দ বছরের বদলে সাত থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন সুরু হয়েছে। অর্থাৎ প্রচলিত সাতসালা প্রাথমিক শিক্ষার বদলে ভবিষ্যতে আটসালা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা চালু হবে। আটসালা প্রাথমিক শিক্ষার পরে ছাত্র-ছাত্রীদের দু বছর ক্ষেতে-খামারে বা কারখানায় কাজ করতে হবে, এবং এইভাবে পূর্বে পরিকল্পিত বাধ্যতামূলক দশসালা শিক্ষাব্যবস্থার ঘোষণার সঙ্গে বাস্তব ব্যবস্থার সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা হবে। দশসালা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনার বদলে আটসালা শিক্ষার ব্যবস্থা কেন প্রবর্তিত হল, সে বিষয়ে এবার অনেক শিক্ষাবিদকে জিজ্ঞাসা করেছি। বেশীর ভাগই প্রথমে বলেছেন যে দশ বছর স্কুলে পড়ার চেয়ে আট বছর স্কুলে পড়ে দু বছর কোন কাজ করলেই শিক্ষার উৎকর্ষ হবে। এ কথার উত্তরে যখন বলেছি যে আট বছরের শিক্ষাব্যবস্থা কোনক্রমেই দশ বছরের শিক্ষাব্যবস্থার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না, আর হাতে-কলমে কাজের ব্যবস্থা দশ বছর বাধ্যতামূলক শিক্ষার পরেও করা যায়, তখন দুয়েকজন সোভিয়েট শিক্ষাবিদ স্বীকার করেছেন যে স্কুলঘর, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের অভাব রয়েছে বলেই দশসালা পরিকল্পনার বদলে আটসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়েছে। তাঁরা এ কথাও বলেছেন যে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ এক বছর বাড়াবার অর্থ প্রায় ষাট সত্তর লাখ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি। তিন বছর মেয়াদ বাড়ালে প্রায় দু কোটি নতুন ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের মতন বিরাট দেশের পক্ষেও হঠাৎ এত বেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

সোভিয়েট শিক্ষাবিদদের এ যুক্তি না মেনে উপায় নেই। বিলাতে যখন শিক্ষার মেয়াদ চোদ্দ থেকে বাড়িয়ে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত করা হয়েছিল, তখন সেখানেও এ সমস্যা উঠেছিল। ভারতবর্ষের কোন কোন রাষ্ট্রে চারসালা প্রাথমিক শিক্ষার বদলে পাঁচসালা প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে কম বেগ পেতে হয়নি। তবে এ কথাও আমার মনে হয়েছে

যে শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনায় এ পরিবর্তনের মূলে আর একটি কারণও রয়েছে। আঠারো উনিশ বছরের আগে বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যবস্থা নেই বলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার শেষে অনেকেই মাধ্যমিক শিক্ষার চেষ্টা না করে কোন না কোন কাজে লেগে পড়ত। গত পাঁচ ছয় বছরে সোভিয়েট রাষ্ট্রে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অনেকখানি বেড়েছে, ফলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার শেষে যারা মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করতে চায় তাদের অনুপাত এবং সংখ্যা দুই-ই বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য যারা আসে, তাদের দাবী মেটানো দিন দিন এমনিতেই কঠিন হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতা-মূলক শিক্ষার প্রবর্তন করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উমেদার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এত বেড়ে যেত, যে তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। সমস্ত দিক বিবেচনা করে তাই সোভিয়েট রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত ধার্য করেছে, এবং মনে হয় এ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে অন্তত তিন চার বছর লাগবে। মহাযুদ্ধের শেষে বিলাতে যখন বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ চোদ্দ থেকে বাড়িয়ে পনেরো করা হয়, তখন সেখানেও দুয়েক বছরে এ পরিকল্পনা পুরোপুরি কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে কোন প্রকৃতিগত ভেদ স্বীকার করা হয়নি। চোদ্দ থেকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর। পুরো পাঁচ বছরই প্রাথমিক শিক্ষার মতন মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমস্ত বিষয়ই সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হয়। আমেরিকার শিক্ষা প্রণালীতে এ স্তরে যে বৈচিত্র্য ও ছাত্রছাত্রীদের মরজীমোতাবিক বিষয় নির্বাচনে যে স্বাধীনতা, সোভিয়েট মাধ্যমিক শিক্ষায় তার কোন নিদর্শনই মিলবে না। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকেই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, দর্শন ও কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাস পড়তে হয়, সঙ্গে সঙ্গে শরীর চর্চাও প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক। শুধু তাই নয়। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষালাভের সুযোগ সকলের মেলে না বলে এ স্তরে ছাঁটা-বাছাই প্রতিপদে করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার শেষ বৎসর হয়তো ষাট সত্তর লাখ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে পৌঁছয়, কিন্তু তাদের মধ্যে বছরে দশ পনেরো লাখের বেশী ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে স্থান পায় না। যারা জায়গা পায়, তাদের মধ্যেও যদি কেউ কোন সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষালাভের অনুপযোগী বিবেচিত হয়, তবে তার পাঠ্যজীবন তখনি শেষ হয়ে যায়। সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রে পাঁচসালা মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থী তাই বড়জোর ষাট সত্তর লাখ। পাঁচ বৎসরের শেষে তাদের মধ্যে খুব বেশী হলে দশ লাখ ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

একে তো রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একই দলের হাতে, সেদিন পর্যন্তও রাষ্ট্রের কোন ব্যবস্থার সমালোচনা করবার সুযোগ ছিল না বললেই চলে, তার উপর পাঠ্যক্রমের বিরাট বোঝা, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকেই প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মনে ভয় যে লেখাপড়ায় বিন্দুমাত্র গাফিলতী হলে পাঠ্যজীবন শেষ হয়ে যাবে। ফলে সোভিয়েট মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষার্থী যেভাবে পরিশ্রম করে সমস্ত বৎসর সমস্ত বিষয়ে পাঠে মনোযোগ দেয়, অন্য দেশে সহজে তার তুলনা মিলবে না। ছাত্র অসন্তোষ বা ছাত্র বিক্ষোভের সোভিয়েট রাষ্ট্রে তাই কোন অবকাশ নেই।

পূর্বেই বলেছি নেপোলিয়নের আদর্শ ছিল যে প্রত্যেক নাগরিকেরই রাষ্ট্রের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন যে

নেপোলিয়নের এ আদর্শ ছাড়াও তরুণ যুবক যুবতীদের সমস্ত উদ্যম শিক্ষাক্রমে আবদ্ধ রাখবার জন্যই সোভিয়েট মাধ্যমিক শিক্ষা এত কঠোর। শিক্ষার্থীদের জাগ্রত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কর্মব্যস্ত বলে অলস ক্ষণের কোন অলস চিন্তা বা সময়ের অপব্যবহারের কথা তারা ভাবতেই পারে না।

সোভিয়েট মাধ্যমিক শিক্ষায় যে ব্যাপক ও বাধ্যতামূলক প্রসার তারও কিন্তু দুয়েকটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। সঙ্গীত, শিল্প, নাট্যকলা বা শরীর চর্চার জন্য বিশেষ ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষালয় এখানে ওখানে মেলে, কিন্তু এ ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম। সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রে মাধ্যমিক সঙ্গীত শিক্ষালয়ে বড়জোর হাজার দশেক ছাত্রছাত্রী রয়েছে, শিল্প, নাট্যকলা বা শরীর চর্চার বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও তার চেয়ে বেশী হবে না। যারা এ সমস্ত বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করতে চায়, তাদের বেলায়ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথমে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করতে হয়। ফলে শিল্পকলা, সঙ্গীত বিজ্ঞান অথবা টেকনিক, সমস্ত ক্ষেত্রেই উচ্চশিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীরা একই ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করেছে বলে সমাজজীবনে তাদের স্থান নির্ণয় অনেকটা সহজ হয়ে দেখা দেয়।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই ছাঁট-বাছাই প্রচুর কাজেই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ যে আরো কঠিন হবে, তা সহজেই বোঝা যায়। বস্তুতপক্ষে, উচ্চশিক্ষার স্তরে সোভিয়েট রাষ্ট্র অধিকার ভেদে বিশ্বাসী। প্রায় দশ পনেরো লক্ষ শিক্ষার্থী প্রতি বছর মাধ্যমিকশিক্ষা শেষ করে, তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত কিন্তু বড়জোর দু লক্ষ তিন লক্ষ ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পায়। প্রবেশের পরেও শিক্ষার্থী জীবনের চার পাঁচ বৎসর প্রতিক্ষণই তাদের শিক্ষালাভের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়, যদি কোন কারণে কাউকে অযোগ্য মনে হয়, তার শিক্ষার্থীজীবন তখনই শেষ হয়ে যায়। স্কুল-জীবনের শেষে আমাদের দেশে যেভাবে নির্বিচারে সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে চায়, যারা কোনক্রমে কণ্ঠেসুণ্ঠে তৃতীয় ডিভিশনে পাশ করেছে তাদের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার দাবী করা হয়, সোভিয়েট রাষ্ট্রে তা কেউ কখনো করতে পারে না। আমাদের দেশে কেউ যদি সাতবার চেষ্টার ফলে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়, আবার পাঁচ-সাতবার ফেল করে অবশেষে দশ বার বছর পরে বি. এ. পাশ করে, আমরা তার অধ্যবসায়ের তারিফ করি। বিলেতে ডিগ্রীলাভের জন্য শিক্ষার্থী বড়জোর দুবার চেষ্টা করতে পারে, দ্বিতীয়-বারে সফল না হলে তার আর কোনদিনই ডিগ্রী মেলে না। সোভিয়েট রাষ্ট্রে বহুক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার চেষ্টার অবকাশও নেই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী মিস্টার এল্‌টিন পরিষ্কার ভাষায় বললেন যে উচ্চশিক্ষা সকলের জন্য নয়, বিদ্যাবুদ্ধি চরিত্রে যারা অগ্রণী, তাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার আছে। তাঁর মতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে দেশের জনসাধারণের অর্থের এবং এ সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের সময়ের অপচয়।

উচ্চশিক্ষার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এ ধরনের ছাঁটবাছাই করা হয়। মাধ্যমিক সঙ্গীত-শিক্ষালয়ে প্রায় দশ হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করে, কিন্তু উচ্চশিক্ষায়তনে তাদের সংখ্যা সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে হাজারও হবে না। নাট্যকলার ক্ষেত্রে মস্কোর লুনাচারস্কী ইনস্টিটিউটে সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্র থেকে বছরে একশো, অর্থাৎ পাঁচ বছরে মোটে পঁচিশো শিক্ষার্থী নেওয়া হয়। সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে বছরে আন্দাজ দু লাখ বা পাঁচ বছরের সমস্ত ছাত্র মিলিয়ে সবসুদ্ধ মাত্র দশ লাখ ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তাছাড়া

যাদের উচ্চশিক্ষায়তনে স্থান মেলে, প্রথম বছরে তাদের উপরও কড়া নজর রাখা হয়, এবং কোনভাবে অনুপযোগী মনে হলেই তাদের ছেঁটে ফেলা হয়। মিস্টার এল্‌টিন বললেন যে প্রথম বছরের পরে যারা টিকে যায়, তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃতিত্বের সঙ্গে পাঠ্য জীবন শেষ করে।

বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য ধরনের উচ্চ শিক্ষায়তন থেকে যারা পাশ করে বেরোয়, তাদের সকলকে কাজ দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সকলে কিন্তু পছন্দমত কাজ পায় না। শিক্ষার্থীকে যে কাজ দেওয়া হয় তা নিতে সে কখনো কখনো আপত্তি এবং দু-এক ক্ষেত্রে একেবারে অস্বীকার করে। সে সব ক্ষেত্রে তাদের প্রথমে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়, বলা হয় যে বর্তমানে অন্য কোন ধরনের কাজ নেই, এবং যে কোন কাজ গ্রহণ করলেই তাতে কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ মিলবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কোন শিক্ষার্থী কাজে যোগ না দেয় তখন আর তার বিষয়ে রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব থাকে না। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে প্রতি বছরই এ রকম ঘটনা কিছু কিছু ঘটে।

উচ্চশিক্ষার বিষয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী আরো ভাল করে বোঝবার জন্য মিস্টার এল্‌টিনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে প্রতি বছরই যখন সমস্ত হিসাবে উপযুক্ত প্রায় আট লাখ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পায় না, তখন তাদের মধ্যে এ নিয়ে অসন্তোষ বিচিত্র নয়, সেজন্য রাষ্ট্র কি কোন ব্যবস্থা দরকার মনে করে না? মিস্টার এল্‌টিন বললেন যে সব ছাত্রই উচ্চশিক্ষালাভ করতে চায় না, অনেকেই মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে কাজ চায়। যদি স্থান না-ও পায় তবে তাতে দুঃখ করে লাভ নেই, তাদের দেশের সমগ্র জনসাধারণের অর্থের অপব্যয় করার চেয়ে দু-এক লাখ ব্যক্তির আশাভঙ্গ করাই বোধ হয় সমাজের পক্ষে বেশী কল্যাণকর। তবে যারা উচ্চশিক্ষার জন্য আগ্রহশীল, কিন্তু বিদ্যালয়ে স্থান পায় না, তাদের এ ব্যাপারে হতাশ হবার কারণ নেই। তারা কাজ করতে করতেও হয় সান্ধ্য বিদ্যালয়ে বা করেসপণ্ডেন্স কোর্সে যোগ দিয়ে উচ্চশিক্ষালাভ করতে পারে। তাতে অবশ্য দু-তিন বছর সময় বেশী লাগে, কিন্তু কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভ করে বলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষা বেশী কার্যকরী হয়। মিস্টার এল্‌টিনের মতে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য ধরনের উচ্চশিক্ষায়তনে যোগ না দিয়েও এভাবে উচ্চশিক্ষালাভ করছে, এ ধরনের ব্যবস্থা ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের পক্ষেই বেশী কল্যাণকর।

আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে আরো খানিকটা আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

ব্যবধান

শামসুর রাহমান

আজো কি সেখানে যাও, যেখানে মায়াবী একদার
স্বর্ণমৃগ দেখা না-দেখায় মেশা? হয় কি সময়?
হয়তো সেখানে আজ নন্দিত, প্রোজ্জ্বল ফুল নয়,
বল্মীক ও রুক্ষ আগাছায় গেছে ছেয়ে চারধার।
তোমার সত্তার দীপে আজ আর আমার আঁধার
হয়নাকো দীপান্বিতা; শুধু মনে-রাখার বিস্ময়
নিয়ে বেঁচে থাকি আজ। ইতিমধ্যে হ'য়ে গেছে ক্ষয়
রৌদ্রঝড়জলে কতো লঘুপক্ষ বছরের ধার।

পুনর্মিলনের সূর্য যেন না-ই জ্বলে দু'জনের
গোধূলি-আকাশে আর; তৃষারের তীক্ষ্ণ শুভ্রতায়
বাসনার শতদল যাক ছিঁড়ে—বিষাদের দান
সন্তপ্ত হৃদয়ে গেঁথে গাবো গান নির্মোহ প্রাণের।
এই ভালো,—তুমি আর আসোনা যে চারু, মৃদু পায়,
কেননা দুর্লঙ্ঘ্য এই নির্দয় কালের ব্যবধান।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে

আনন্দ বাগচী

আমিই লম্পট, আমি নটবর, গল্প লিখি নারীর হৃদয়ে :
যেমন চোখের নিচে জল জ্যোৎস্না অবয়বহীন অন্ধকার
একাকার হয়ে থাকে, বৃষ্টির বিবর্ণ শব্দে বৃশ্চিকের জ্বালা,
প্রথম পুরুষ আমি তেমনি আছি, দূরে ভীত খণ্ডিতা নায়িকা;
[হে নিষাদ, আর কেন প্রেমিকের ছদ্মবেশে কেন!]
অনিষ্ট চেতনা ফিরছে উল্টোপাল্টা ক্ষুরের মতন
চিবুকে গলার কাছে, ক্ষিপ্রনাচে বোধের ফেনার নিচে নিচে,
স্ফটিক জলের জন্যে কেন ডুববে গৃহস্থ আঁধারে,
কুটুনীর ছায়াবহ স্বপ্নস্বরূপিনী নিশিথিনী
এসেছে বাহির হয়ে চিরকাল যে ছিল অন্তরে।

তিন দিকে ত্রিকাল জ্বলছে যেন ভ্রান্ত চৌমাথার আলো।
দুরারোগ্য স্মৃতি ছুঁয়ে অগণিত রমণীর শব,
সবাই এখন নগ্ন, মৃত, সুখী নির্লজ্জ নীরব,
ঈশ্বর মঠোর মধ্যে ধরা আছে আত্মার বিকার,
দেবালয় অন্যদিকে, প্রবাহিত দুঃখের ওপারে।

আমিই যৌবনে জ্বলছি, বাইরে জল পড়ে পাতা নড়ে

দুটি দেবদারু ও পাঁচটি পায়রা

রাম বসু

নীলিমার স্থির নিচে ছেলে আর মেয়েটি তখন
দোঁহে দোঁহাকার মুখে অপরূপ রূপ খুঁজে পেয়ে
মূক হয়ে গিয়েছিল মুগ্ধ দেবদারুর মতন
পাঁচটি পায়রা শাদা পাখা দিয়ে রেখেছিল ছেয়ে।

মুগ্ধ দেবদারুর মতন তারা হাওয়ায় হাওয়ায়
পল্লবিত তন্দ্রাস্বরে হাসির যুগলধ্বনি তোলে
পাঁচটি পায়রা সেই ধ্বনি ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যায়
মেঘের ইচ্ছার মত, নীহারিকা হয়ে শূন্যে দোলে।

পাখায় জন্মের ঋতু দুই চোখ বোধের বিস্ময়
উত্তরণ তৃষ্ণা বিদ্ধ সীমা ভেঙে সূর্য বলয়িত
তাদের অন্তিম কান্না অদৃষ্টের কষ্ট মনে হয়
ছাই হয়ে পায় মাটী ধ্বনি থাকে দৃশ্যের অতীত।

মৃত ইচ্ছা স্বপ্ন নিয়ে আকাশের দিকে দেবদারু
শিকড়ে শোকের নদী অমাবস্যা নিষ্পত্র শাখায়
শূন্যতার পটে মৌন তপস্যার মতন সুচারু
দগ্ধ হয়ে মুখোমুখি শুষ্কতর দৃষ্টিতে তাকায়।

সোনার পদ্ম

গোবিন্দ চক্রবর্তী

সে আছে এখানে যদি
ওখানেও থাকে আর থাকে—
কখনো সন্ধ্যার তারা,
ভোরের বিহঙ্গ হয়ে ডাকে।
বৃষ্টি হ'য়ে টোকা দেয় দোরে—
আকুল বকুল গন্ধে নিশীথ প্রহরে
স্বপ্নের মতন শিহরায়।
কখনো উতল হাওয়া—ঝাউয়ের শাখায়
আনমনে একা দোল খায়।
জোনাকির ক্ষণদীপ্তি তুলে ধ'রে ফের
নিশানা চেনায় দিগন্তের
দিগভ্রান্ত হতাশ পথিকে।
সে র'য়েছে, র'য়েছে যে, আছে দিকে-দিকে।

কখনো মৌমাছি গুন-গুন
জ্বালে এক ছায়া-ছায়া সুরের আগুন।
কোনোদিন উদাসী দুপুরে
ঘুঘুর ঘুমন্ত সুরে
ঝরায় কী অব্যক্ত কাঁদন!
হ'তে চায় কভু বুঝি অশথেরো মন—
নিরিবিলি একান্ত নির্জন।
তারপর গ্রামান্তের নদীটির বাঁকে
আলোর আলপনাটুকু ছায়া দিয়ে আঁকে।
দিনান্তের গোধূলির মেঘে
আবার চড়ায় রঙ কখন আবেগে
হলুদ, গোলাপী, নীল, ফিকে।
রয়েছে সে, আছে-আছে, থাকে দিকে-দিকে।

সে যে ডাকে শুধু, ডাকে আর ডাকে—
কত নামে ফাঁকে-ফাঁকে
হৃদয় জড়ায় শত পাকে।

একটি সোনার পদ্ম জীবনের পাঁকে :
সে-ই না একাকী ফুটে থাকে?

স্মৃতি

তরুণ সান্যাল

দু'একজন বন্ধু শুধু স্মৃতি হবে, বাকি সব মৃত,
ধূলায় কাদায়, কিংবা জনপদে, চিরুন সড়কে—
বারেক দাঁড়াও যদি, দেখিবে, যা যুগের নিভৃত
তার শিরে কণ্টকের শিরোপা, সে জটিল নরকে
হয়তো ভাবিবে তুমি,—স্খলিত পুণ্যের জয়মালা
তোমারে দিল না যারা, তারা সব কৃমির উপমা

দুরতম তারা, আমি এই ক্ষুদ্র গ্রহের নিরালা
চাহি না, চাহি না, দিয়ো অনন্ত রাত্রির প্রিয় অমা।

যে বঙ্গে আমার জন্ম নরদেহে, প্রজাপতি জানে
সেখানে নিহত প্রিয় প্রণয়ের নষ্ট বাসনার
পল্লবে নীহার জমে, কণ্টকের বিস্ফার উদ্যানে—
তবু প্রায়শই শব্দ-মিলে কবি কবিতা বানায়,
মাঝে মাঝে পণ ঝরে, গুলমোরের স্তবকে, নিভৃত;
দু'একজন বন্ধু স্মৃতি, কিছু শব্দ প্রিয়, বাকি মৃত।

শিল্পীর জন্য শোক

শিবশম্ভু পাল

গভীর অন্তর তার পঙ্গু করে মহানন্দে নৃত্য করো, সুখ।
নিবিড় মোহিনী স্পর্শে বিষ আছে; গোপনে গোপনে
আনম্র মাটির বুক কুরে কুরে খেয়ে গেছ বল্মীকের মতো
উন্মীলিত ফুলদল ঝরে আছে স্মৃতির ওপারে।

প্রেমিক, স্মরণ করো নীলিমায় একদিন দুর্বোধ্য বিষাদ
সমাচ্ছন্ন রেখেছিল প্রথম দেখার কুলপ্লাবী
সমুদ্রের কল্পমূর্তি; অবুঝ দুঃখের ধারাজল
হৃদয়ের অন্ধকারে অবিরল রিমঝিম শব্দে বরিষে
সেদিন আকণ্ঠ জ্বালা রক্তের ভিতর হতে দীপ্ত বিকশিত
পল্লবে পল্লবে তার বেজেছিল জাদুকরী শিল্পের বাতাস।

উন্মীলিত ফুলদল ঝরে আছে স্মৃতির ওপারে।
সার্থক প্রেমিক, তুমি চেয়ে দেখ মায়াবিনী আলোর প্রপাত
সারা অঙ্গে রেখে গেছে অবসিত বিস্ময়ের ছায়া
কেননা অন্তর জুড়ে সমর্পিত নায়িকার স্পর্শ রাখে সুখ।

শূন্য স্তব্ধ বনাঞ্চল, ছিন্নভিন্ন পাণ্ডুলিপি আর
এরি মাঝে পড়ে আছে অনাদৃত প্রাণহীন সুকুমার দেহ
কে তাকে জাগাবে, তুমি মৃত্যুরেই ভালোবেসে বাঁচো
নিবিড় মোহিনী স্পর্শে হে আবিষ্ট, আনন্দিত, নির্বোধ প্রেমিক।

ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রামাঞ্চলে জমি খরিদ করতে দেওয়া হোক, ব্যবসার জন্যে এই দাবী জানিয়ে গভর্মেণ্টের কাছে কলকাতার প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীরা যে মেমোরিয়াল পাঠিয়েছিলেন, গভর্মেণ্ট তাঁদের ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারীর সেই মেমোরিয়াল প্রস্তাবসহ কোর্ট অব ডিরেক্টরদের কাছে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পয়লা সেপ্টেম্বর তারিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা তাঁদের ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখের চিঠি মারফৎ নির্দেশ পাঠালেন যে 'যা কিছু আইনকানুন এতো দিন চলে আস্‌ছে ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে জমি কেনা সম্বন্ধে, সে নিয়মগুলি সম্পূর্ণ মেনে চল্‌তে হবে।'। কোর্ট অব ডিরেক্টরদের এই নির্দেশের ফলে গভর্মেণ্টের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেলো।

কোর্ট অব ডিরেক্টরদের এই নির্দেশের প্রতিবাদ করবার জন্যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে টাউন হলে একটি প্রতিবাদ-সভা ডাকা হোলো। সেই সভায় অগ্রণীর অংশ গ্রহণ করলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। সেই সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুর এই প্রস্তাবটি আনলেন—'ব্রিটিশ প্রজারা জমি দখল করতে পারবে ও জমি খরিদ করতে পারবে—এই দুইয়ের বিরুদ্ধে যে আইন রয়েছে এবং কম্পানী-শাসিত এলাকার মধ্যে স্বাধীনভাবে ও অবাধে বসবাস করতে পারবে—এর বিরুদ্ধে যে আইন আছে, সেই আইনগুলি ব্যবসার উন্নতি, বাণিজ্যের উন্নতি ও তৈরী মাল উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতির আইনগত বাধা সৃষ্টি করেছে, এই বিবেচনা করে এই সভা যে আর্জি পার্লামেণ্টের কাছে পাঠিয়েছেন যে ব্রিটিশ প্রজাদের ভারতবর্ষে আসার ও বসবাস করার বিষয়ে যে সব আইনগত বাধা আছে সেগুলি দূর করা হোক, কেন না এই বাধাগুলি এদেশের বাণিজ্যের উন্নতির পরিপন্থী,—সেই আর্জির সমর্থন করছে।'*

এই প্রস্তাবের সমর্থনে দ্বারকানাথ বললেন,—"নীলের চাষ ও ইয়োরোপীয়দের বসবাস দেশের ও দেশের সব শ্রেণীর লোকের প্রভূত উপকার সাধন করেছে। জমিদারেরা ধনী হয়েছেন ও উন্নতি করেছেন, চাষীদের অবস্থাও অনেক উন্নত হয়েছে। যে সব জায়গায় নীলের চাষ নেই ও নীলের কারখানা নেই সে সব জায়গার অধিবাসীদের চেয়ে এদের অবস্থা অনেক ভালো হয়েছে। নীলের চাষ যেখানে হচ্ছে তার কাছাকাছি জায়গার জমির দাম বেড়ে গেছে ও চাষবাসেরও খুব দ্রুত উন্নতি হয়েছে। যদিমাত্র একটি জিনিস তৈরী করতে ইয়োরোপীয়দের যে কর্মকুশলতা ও উৎপাদন-নৈপুণ্য আছে তার ব্যবহারে এতো উপকার সাধিত হয়ে থাকে, তাহলে আরো যে সব জিনিস এদেশে উৎপন্ন হতে পারে সেই সব জিনিসের উৎপাদনে ইংরেজদের কর্ম-নৈপুণ্যের, মূলধনের ও পরিশ্রমের অবাধ ব্যবহারে

*"That this meeting considering one of the main legal obstructions to the commercial, agricultural and manufacturing improvements to consist in the obstacles which are opposed to the occupancy or acquisition of land by British subjects, and against their free resort to and unmolested residence within the limit of the Company's administration, does approve and confirm."

আমরা আরো কতো না উন্নতি করতে পারি! পৃথিবীর যে কোনো দেশের মতো আমাদের দেশ যে সব উৎকৃষ্ট জাতের জিনিস প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন করতে পারে সেগুলির উৎপাদন ইয়োরোপীয়দের অবাধ সংযোগ ছাড়া সম্ভব নয়।"*

এই প্রস্তাব সমর্থন করে রামমোহন রায় বললেন—'যে প্রস্তাবটি এখুনি পড়া হোলো তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দ্বারকানাথ ঠাকুর যা বললেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক মত। নীলকরদের সম্বন্ধে আমি বল্‌তে পারি যে বাংলা ও বেহারের কয়েকটি জেলায় নীলকুটি-গুলির কাছাকাছি অঞ্চলে আমি ঘুরেছি। আমি দেখেছি যে নীলকুটির আশেপাশের বাসিন্দেরা নীলকুটি থেকে দূরের জায়গার লোকদের চেয়ে ভালো কাপড় পরে ও ভালো অবস্থায় বাস করে। নীলকররা আংশিকভাবে ক্ষতি করে থাকতে পারে কিন্তু সব দিক বিচার করে বলা যেতে পারে যে সরকারী ও বে-সরকারী সব শ্রেণীর ইয়োরোপীয়দের চেয়ে এই নীলকরেরা এদেশের সাধারণ লোকের অনেক বেশী উপকার করেছে।'†

প্রসন্নকুমার ঠাকুরও এই প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তৃতা দেন। এই প্রস্তাব তখন সভার সকলের সমর্থন লাভ করে।

রামমোহনের ও দ্বারকানাথের বক্তৃতা দুটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে যাতে ইয়োরোপীয়দের মূলধন ও নৈপুণ্য ব্যবহার করে এদেশে নানা ধরনের কারখানার পত্তন হয় ও কৃষির উন্নতিসাধন করা যায়—এই ছিলো তাঁদের প্রাণের ইচ্ছে। ইয়োরোপীয়দের সাহায্য ছাড়া যে এ দুটি কাজ সম্ভব নয় এ বোধ ঐতিহাসিক-দৃষ্টিসম্পন্ন এই অসাধারণ মানুষ-দুটির ছিলো।

পনেরোই ডিসেম্বর এই মিটিং হয়ে গেলো, তার দুদিন পরে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের সতেরোই ডিসেম্বর কলিকাতার নাগরিকেরা ইয়োরোপীয়দের এদেশে বসবাসের সমর্থন করে একটি দরখাস্ত পাঠালেন পার্লামেণ্টের কাছে। সেই দরখাস্তে তাঁরা বললেন—

*"I have found the cultivation of indigo and residence of Europeans have considerably benefited the country and the community at large, the Zamindars becoming wealthy and prosperous, the Ryots materially improved in their condition and possessing many more comforts than the generality of my countrymen where indigo cultivation and manufacture is not carried on, the value of land in the vicinity to be considerably enhanced and cultivation rapidly progressing..... If such beneficial effects as these I have enumerated, have accrued from bestowing European skill in one article of production alone, what further advantages may not be anticipated from the unrestricted application of British skill, capital, and industry to the very many articles which this country is capable of producing, to as great an extent, and of as excellent a quality, as any other in the world, and which of course can not be expected to be produced without the free recourse of the European."

†"I fully agree with Dwarkanath Tagore, in the support of the resolution just read. As to the Indigo planters I beg to observe that I have travelled through several districts in Bengal and Bihar and I found the natives residing in the neighbourhood of Indigo plantations evidently better clothed and better conditioned than those who lived at a distance from such stations. There may be some partial injury done by the Indigo planters, but on the whole, they performed more good to the generality of the natives of this country, than any other class of Europeans, whether in or out of the Service".

'That your petitioners, British and Native inhabitants of Calcutta.....are anxious to multiply and draw closer the ties of interest and affection which connect the two countries, by the removal of those legal obstructions to the application of British skill, capital and industry to the commercial and agricultural resources of India, which are no less incompatible with national prosperity, than repugnant to the laws by which all other colonies and British dependencies are governed.....Your Honourable House must be satisfied from the uniform result of experience in all ages and countries, *that trade cannot be profitably conducted by a Government without the unjust and impolitic advantages of a monopoly, and that a Government trade in commerce with that of private merchants, must not only be attended with a waste of the public revenue, but be liable to come into unequal competition and injurious collision with the operations of individuals.* (Italics mine—S.T.) These objections have long been acknowledged to be applicable to the India trade carried on by the East India Company and enforce the expediency of divesting that corporation, while exercising any of the functions of Government, of the few commercial establishments which still remain to them. The degree in which their monopoly of the tea trade contracts the extent of commercial intercourse with China, and enhanced the price of tea, is equally wellknown to your Honourable House. The people of England are thus indirectly taxed more than twice as much as they would be directly, if the trade were opened, and the capital stock of the East India Company (the dividends on which are now paid from the extra price levied on the consumer) were added to the national debt. Of the ships that would there be engaged in importing tea into England, some would there be engaged in importing tea into England, some would bring their outward cargoes to this country, where there is at present a difficulty in procuring return cargo, but that resources and convenience to both countries is, with many others, prevented by the monopoly'.

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর বাণিজ্যের অধিকার রদ করে দেওয়ার দাবী জানানোর জন্যেই স্বাধীন ব্যবসায়ীদের এই দরখাস্ত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী অক্টোপাসের মতো গুচ্ছের হাত বের করে এমন করে এদেশের বাণিজ্য দখল করে বসেছিল যে কারো সেখানে হাত বাড়াবার উপায় ছিলো না। নানা রকম আইনকানুন তৈরী করে অন্য ব্যবসায়ীদের এদেশে এসে ব্যবসা করবার সব পথ ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী দিয়েছিলো বন্ধ করে। সেই একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যবসার অবাধ-স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে ব্যবসায়ীরা একটানা

লড়াই করে চলেছিলো। শাসকশ্রেণী যেমন আইনের সাহায্য নিয়ে নিজ শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখে, অন্য শ্রেণীগুলিও তেমনি নীতির দোহাই পেড়ে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে পুষ্ট করতে চায়। এই দুই শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাতের ভিতর দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র এগিয়ে-পেছিয়ে এগিয়ে চলে। জিনিসের যা দাম হোতো বাণিজ্যের অধিকার সকলের থাকলে, একচেটিয়া ব্যবসা-ব্যবস্থা যে কেমন বেপরোয়াভাবে তার চেয়ে দ্বিগুণ দাম আদায় করে জনসাধারণের কাছ থেকে, তার উদাহরণ স্বরূপ চীন দেশের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর যে চায়ের ব্যবসা ছিলো সেই ব্যবসার কথা উল্লেখ করা হোলো এই দরখাস্তে। অবাধ বাণিজ্য চলন থাকলে যে দাম দিতে হোতো, চীনের সঙ্গে চা-ব্যবসায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া অধিকার থাকায় ইংলণ্ডের লোকদের কাছ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী তার দুগুণের বেশী দাম আদায় করছিলো। একচেটিয়া বাণিজ্য-ব্যবস্থার এই হোলো দোষ। না দেয় তা নতুন নতুন কল-কারখানা গড়তে, নতুন নতুন জিনিস তৈরী করতে, না দেয় তা জিনিসের দাম কমাতে। একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রের দোসর।

১৫ই ডিসেম্বর তারিখের টাউনহলের মিটিংয়ের সম্বন্ধে ও এদেশে ইয়োরোপীয়দের বসবাস সম্বন্ধে ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের "ইণ্ডিয়া গেজেট" পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই মন্তব্য ছাপা হোলো—

"Another important point is the condemnation which the Company's internal trade received from the meeting. A considerable portion of the revenue derived from the country by the Company as sovereigns, is employed in the production and manufacture of different articles composing the internal and export trade of India. In the opinion of the meeting, such an employment is an obstruction to the industry of individuals, is prejudicial to good Government and to improvement.....and it was accordingly resolved that the entire abolition of the branch of the Company's commercial transactions in India is desirable. *The rulers of this great country.....are monopolist-manufacturers of salt, which they sell to the highest bidder. They are also monopolist-manufacturers of opium. They are manufacturers of silk, and by their exhorbitant prices and by the superior advantages they enjoy, they have driven the private manufacturer out of the field.* (Italics mine—S.T.).

They are shippers, for they speculate on their own account by shipments made at their own risk to and from England, India and China. They are shipping agents.....thus it is by their invidious and unequal competition they interfere with almost every branch of public industry, retard the progress of public and private injustice. The inhabitants of Calcutta have resolved that the entire abolition of this wretched barbarous and mongrel system of sovereign manu-

facturers, merchants and agents, is the only mode of remedying its recognised evils."

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী যে কেন বাণিজ্যের অবাধ অধিকার-নীতির এতো ঘোর বিরোধী ছিলো তা "ইণ্ডিয়া গেজেট"-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য নির্মমভাবে ফাঁস করে দিলো। নুনের একচেটিয়া ব্যবসা কম্পানীর হাতে ছিলো, তাই সব চেয়ে বেশী দাম যে দিতো তাকে নুনের ইজারা দেওয়া হোতো। তার ফলে নুনের দাম তার যথার্থ দাম থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাজার গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হোতো। আফিং আর রেশমী কাপড়—এই দুয়ের উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার ছিলো কম্পানীর। তার ফলে এদেশের লোকদের আফিং খাইয়ে আর রেশমী কাপড়ের দাম খুশি মত বাড়িয়ে কম্পানী অঢেল টাকা লুটছিলো। সাধে কি অবাধ-বাণিজ্যের দাবী উঠতেই এদেশের লোকের সর্বনাশ হয়ে যাবে বলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী চীৎকার করে পাড়া মাতাতে সুরু করেছিলো!

গোঁড়া হিন্দুয়ানির মুখপত্র "সমাচার চন্দ্রিকা"-তে পনেরোই ডিসেম্বরের টাউন হলের মিটিংয়ের একটা বিবরণ বার হয়। এদেশে ইয়োরোপীয়দের বসবাসে ঘোর আপত্তি জানিয়ে "সমাচার চন্দ্রিকা" লেখেন—"ইংরেজরা যাতে এদেশে বসবাস করতে পারেন ও চাষবাস করতে পারেন এই দাবী জানিয়ে আর্জি পেশ করবার জন্যে টাউন হলে একটি মিটিং হয়েছিল। এই খবর পেয়ে ছোটো বড়ো ধনী গরীব সব জমিদার ও ইজারাদারেরা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে, কেন না যদি ইয়োরোপীয়দের এদেশে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে এদেশের লোকদের অনেক অসুবিধে ভোগ করতে হবে। ইংরেজরা যদি এদেশে জমিদার ও চাষী হিসেবে আসে তাহলে আশঙ্কা হয় যে এদেশের লোকের জাত যাবে, তাদের প্রাণধারণের উপায় নষ্ট হয়ে যাবে এবং জমি নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে এদেশবাসীদের একটানা বিবাদ চলবে। ইংরেজদের এদেশ দখলের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত, এদেশবাসী শান্তিতে বাস করছিল। সন্দেহ নেই যে যতদিন ইংরেজরা এদেশ শাসন করবে ততদিন ন্যায় বিচার অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু যদি তারা আমাদের জমির ও সম্পত্তির ভাগীদার হতে সুরু করে তাহলে দেশের লোকের দুর্দশার শেষ থাকবে না। এই আর্জি আমাদের যে কতদূর উৎকণ্ঠিত করেছে তা বলে শেষ করা যায় না।"

"সমাচার চন্দ্রিকা"-তে টাউন হলের মিটিং সম্বন্ধে নানা রকম মন্তব্য বার হবার অল্প দিন পরে পরে দুটি চিঠি বের হলো "সংবাদ কৌমুদী"-তে। একটি চিঠি বের হোলো ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী আর একটি বের হোলো দশই জানুয়ারী। দুটি চিঠির লেখক হচ্ছেন 'নিরপেক্ষ জমিদার' অর্থাৎ দ্বারকানাথ ঠাকুর। দুটি চিঠিই আমরা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। পয়লা জানুয়ারী চিঠিতে দ্বারকানাথ লিখছেন—

To the Editor of the Sumbud Kowmoodee

Sir,

By inserting the following remarks in your Journal the intelligence thereby diffused will destroy the cloud of misrepresentation and reveal the truth to all persons.

In the 572 page of the Chandrika the Editor thereof, inserted an account of the meeting at the Town Hall on the 15th December,

1829, in which there are many mis-representations. First, it is stated, "we fancy that of the natives of India, only Baboos Dwarakanath Tagore and Prusunnu Coomar Tagore were present." This circumstance is erroneously represented, because Baboos Chundra Coomar Tagore, Shib Chunder Sircar, and many others were present, but being unacquainted with their names I cannot communicate them. Did the Editor of Chundrika not look upon them? The aforesaid Baboos are Zemindars and have transactions in indigo etc, if therefore they had understood the objects of the meeting to be injurious to their prospective benefit they would not have hesitated to oppose them. Secondly, the Chundrika states that, "none of the Honourable Company's Civil or Military Servants attended the meeting, and we can not learn from any paper what is their opinion on the subject."

This observation is also very incorrect because about thirty of the Honourable Company's Civil, Military, Medical and Clerical Servants of rank, attended the meeting in question ; among whom I observed Mr. H. T. Prinsep, the Secretary to the Government ; Mr. T. G. C. Plowden, the Collector and Salt Agent ; Mr. Richardson of the Bengal Army ; Dr. Strong and the Revd. Padre..... ; these names are particularly known to me. None of the Company's Servants having expressed their opposition they of course acquisced in the propositions laid before the meeting.

If the free resort of Europeans were esteemed unfavourable by the Company's Servants, they most certainly would have expressed their opinions, as Mr. C. G. Middleton, the Civil Servant, did at a late similar meeting at the Cape of Good Hope. The reason the Company's Servants not speaking their favourable sentiments on the subject at the meeting, was only from the fear they entertain of the Court of Directors, because they signed a Petition about the Sugar-trade, and Free resort of Europeans to India in 1827 ; therefore I think the objection that these gentlemen have to sign the present Petition is, on account of the late order from the Court of Directors. Thirdly, the Chundrika asks his Native subscribers, "what advantage" this Petition "will bring to the Natives who have signed or may sign" it.

The Editor of the Chundrika, is not a Zemindar, nor has he any transactions in indigo or in trade, neither does he possess any knowledge of affairs in the Mofussil ; had he (the Editor) the slightest

knowledge of any of these three, he would not have asked such a question. He may speak to any Ryut, who has been engaged under Indigo Planters, and who has lived in the same place, and been employed there, before the cultivation and manufacture of indigo, and by the information he will thus obtain, his forgetfulness or error may be removed: previous to this period, no person has perceived the Editor of the Chundrika's ignorance; however, it is absolutely necessary to fulfil the desire of a questioner.

In answer to this query, I begin by enquiring of him whether a Zemindar ought to be intelligent and a Ryut industrious?

It is generally acknowledged that wherever the peasantry are numerous and clever in their several occupations, the land will be the better tilled, and the rents of the Zemindars will be increased, by which means no land will finally remain uncultivated; *whence it is certain that industry, skill and a numerous population are required for the improvement of the country; on such a subject the colour of the inhabitants is perfectly immaterial, whether they be white or black.* (Italics mine—S.T.) From this assertion, I may infer, that by the introduction into this country of the industry and skill of Europeans, and by permitting them to reside freely in it and superintend the cultivation of land, there will be great benefit to the community at large.

Behold, by the free residence in, and cultivation of, the land by Europeans, its value will be materially enhanced; for, in proportion to the number of purchasers, will be the increase in price; as at auction sales, where, by the resort of many persons, goods are better sold. It is known to all that where many inhabitants are congregated, the rent of houseland is augmented; by which the Zemindars, Izaradars, Kutkindars etc. are considerably benefited.

Again, in consequence of the increased cultivation of the land, the husbandmen will receive better pay, and it is already wellknown that by the residence of Indigo factories in the district of Jessore and its vicinity, and on account of their skill in manufacturing etc, the wages of labour have increased from I rupee and I rupee 8 as. to 3 rupees 8 annas or 4 rupees, per month. Even the bearers and servants formerly received their wages in cowries, that is calculated by the Kahon; now how many rupees do they receive? I know for certain that in those parts of the Hooghly district, where indigo or

other valuable productions of the soil are not attended to, that the wages of the labourer do not even at the present day exceed 2 rupees 4 annas to 2 rupees 8 annas per month; and indeed it is a fact, easily ascertained, that into whatever Zillah an influx of Europeans takes place, the natives thereof are always enabled to obtain a comfortable and in many instances a most respectable livelihood.

At the decennial settlement of the land in this country, the value of estates was exceedingly depressed; many extensive Talooks having been bought at the value of 2 or 3-years produce; whereas at the present period several of such Talooks have been disposed of for the equivalent value of 20, 25, and even as high as 30 years produce. What is the reason of this extraordinary increase in the value of landed property? Why, by the resort of Europeans into the country, by their instructing the native husbandmen and manufacturers; by their improved mode of preparing indigo etc. etc. etc. and lastly, by purchasing land under assumed names.

I ask every unprejudiced man to consider, that two crores of rupees are annually expended in this country in the production and manufacture of indigo, the greater part of which passes into the hands of the natives, who never even dreamt of such a mine of wealth, previous to the arrival and residence of Europeans in the mofussil; I do then ask every unprejudiced man to consider this substantiated fact, and if he can to deny unattented that the free resort of Europeans to his country, would with extensive future benefit this country.

It is not evident to the Chundrika, how much the price and rent of land and houses in Calcutta, exceeds that of the Mofussil, and also how the native community of Calcutta excel their brethren in the interior, in intelligence, in mercantile experience, and by laying aside their former habits of meanness and other defects; whence then is this amilioration but by the settlement of Europeans amongst us? Indeed there are but a few malicious and self-interested persons, who although aware of the benefits resulting from the invigorating skill and industry of Europeans (and who by their residence in the mofussil and their frequent association with the natives would be naturally desirous for the prosperity of all around them) there are I say, but few individuals who are not jealous in this good cause.

The Editor of the Chundrika has stated that in page 586 that "by the residence of Europeans in the mofussil and their cultivation

of land, our caste may be endangered." To this I reply, how can such a result be imagined, when Europeans have for many years settled in Calcutta, and yet no Hindoo loses his caste on that account? Why therefore should the natives of the mofussil suffer a deprivation of theirs by mixing with Europeans? The Chundrika again asserts that that "by the residence and cultivation of the land by Europeans our usual food may suffer in its culture". This is also a very mistaken nation, because by skilful and regular management it is possible that the produce of grain may be much increased ; and the abilities of the English in this respect are known to all.

The Chundrika also observes that " perpetual disputes will always arise between the Europeans and Natives in the mofussil respecting land etc." To this I reply, when did the Editor of the Chundrika know the mutual disputes of the natives themselves to decrease, that he should suppose that by the free residence of Europeans among them disputes should arise? Business and disputes go hand in hand, that is, no business is carried on without occasional disputes. With whom quarrels? I draw the inference from the European living in harmony with the natives in this city, that they will not engage in disputes with my countrymen in the mofussil, who too frequently foment dissention amongst each other. As the Europeans are well acquainted with the regulations or laws of Government, what reasons have they to quarrel with any person!

The free resort of Europeans to this country would be highly advantageous and without the least injury to any class of persons, whether high or low, rich or poor, Zemindar or cultivator ; particularly to Mostsuddees or Superintendents, Head Sircars, Gomashtas etc. who will derive their support from them: this may be observed in Calcutta.

Perhaps the Chundrika is not a well-wisher of others, consequently he may be desirous of preventing the promotion of anything which tends to the public benefit ; but upon slight consideration his misconceptions can have no weight. It is to be hoped this will be found sufficient.

An impartial Zemindar.

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের দশই জানুয়ারী "সংবাদ কৌমুদী"-তে দ্বারকানাথ ঠাকুর এই দ্বিতীয় চিঠিটি বের হোলো—

To the Editor of the Sumbud Kowmoodee

Sir,

Some groundless objections have been brought forward against colonization, in a letter published in the Samachar Chandrika of the 12th Poush, and in the observations made by the Editor of that paper. To these I will make a brief reply. A Zemindar observes, that the poor women who sold thread spun in this country, find themselves placed in great distress by the importation of thread made in Europe ; and, that the trade of flour vendors has been stopped in consequence of the setting up of European machinery in this metropolis, for the grinding of flour, and he is therefore apprehensive, that colonization will be attended with such injurious effects. I answer, while we are witnesses to the fact, that the women who sold thread and the flour-vendors still continue their respective trades, we can not admit the destruction of those trades. *The only change has been, that an abundance in the above articles has affected a reduction in price. This, far from being injurious, ought rather to be considered a beneficial result. The poor class of people are now enabled, in consequence of the reduced price of good cloths, to obtain what they before only wished but could not afford and the same may be said with respect to flour. To feel aggrieved therefore by the mere apprehension of some slight injury accruing to a few individuals, while the community at large is greatly benefitted, is, in fact, wishing ill to society.* (Italics mine—S.T.) It is the sincere wish of traders that the articles in which they deal may be lessened in quantity, and consequently raised in value ; but the wish of a few self-interested persons can by no means be considered praise-worthy. For instance, the introduction in this country of the different kinds of English machinery for printing has been no doubt productive of disadvantage to a certain number of copyists ; but what sensible man will, from this consideration, shut his eyes against the great benefits which have arisen by procuring livelihood to many, by multiplying books, and by diffusing knowledge..... The Editor of the Chundrika instances five cases that of house-builders, carpenters, goldsmiths, tailors, and boatmen, and observes, that the profits accruing to people engaged in the above occupations have considerably diminished from the present competetion of Europeans, and that many natives who formerly followed the same callings had made their fortunes. In adducing

this instance to support the favourite opinions of the Editor, he has not considered the real circumstances of the case, but has looked to the mere surface of things. The truth is, that when a large body of Europeans came into Calcutta and established themselves in different trades, people began to learn their business, and after acquiring sufficient skill, were employed by these Europeans on advanced wages. Before this an individual or two, who excelled in their profession, had monopolized the whole business from the absence of suitable competitors, and had thereby made an immense profit. Let us only consider the numbers of house-builders living in each division of Calcutta ; how many carpenter's, goldsmith's and tailor's shops have been established, and to what an extent boats have multiplied,—and all these people are not in want of business—far from it. When we have occasion to employ any one of them, we find them seldom agreeing to any terms which fall short of what they wish to get. The number of workmen in this town is not easily calculated, and even with this increase in their number, the present lowest rate of tailor's wages is from 7 to 8 rupees, and the highest not less than 16 rupees a month. Fifteen years ago their rate was four rupees, and the highest not more than eight rupees. Formerly carpenters made large pestles and mallets, and at the most were able to earn 3 or 4 rupees only ; where as from the extensive business now carried on by Europeans, some of the carpenters earn 40, others 50 rupees ; and the case is the same as to goldsmiths, house-builders, boatmen, and others.

The Editor further observes, that "the establishment of Gibson and Co. as tailors, of Rolt & Co. as carpenters, and of Hamilton & Co. as jewellers, has impoverished the natives who were engaged in those occupations." I beg of the Editor to go a little about the shops of those gentlemen and see how many hundreds of natives are employed by them at fair remunerations. Such a large portion of the community were never so well supported even in the times of the great princes, nor have we heard of an instance. *The fact is, that formerly the whole business having been engrossed by one or two persons, they made the greatest profit. At present the trades being left free to general competetion, there is a numerous body of competitors, and each of them can not of course be expected to make the same degree of profit as was done before. All of them, however, find employment owing to the extensive business of Europeans, and on the whole they earn more now. Their earnings are comparatively greater now than before.* (Italics mine—S.T.)

We hence conclude that no one will after ascertaining the general opinion on the subject, and making proper enquiries into the matter, be disposed to enter into such a perverse dispute about the benefits which will arise from the free settlement of Europeans in this country.

January 10. An Impartial Zemindar.

এই চিঠি দুটি দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থনীতির জ্ঞান এবং ইতিহাসের ধারায় কোনটি কখন সাধন করা কর্তব্য ও কোন শক্তি দিয়ে সেটি সম্পন্ন করতে হবে সে সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণার সাক্ষ্য দেয়। তা ছাড়া কলমের মুন্সিয়ানার পরিচয় তো ছত্রে ছত্রে আছে চিঠি দুটিতে। ভারতবর্ষে শিল্প-বিপ্লব ঘটাতে হবে, পুরনো উৎপাদন-প্রণালীকে বাতিল করে দিয়ে তার জায়গায় কল-কারখানা বসিয়ে নানা ধরনের জিনিস ও সস্তা জিনিস উৎপন্ন করতে হবে। এইটেই হোলো সেই যুগের ইতিহাস-নির্দিষ্ট কর্ম। তাই সেটা ধলা আদমী দিয়ে হোক কিম্বা কালা আদমী দিয়ে হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। যে কোনো শক্তিকে ব্যবহার করে এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। অতি সচেতন ভাবে এই শিল্প-বিপ্লব ঘটাবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন দ্বারকানাথ ও রামমোহন। নানা অজুহাতে এই শিল্প-বিপ্লবকে বাধা দেবার চেষ্টা করছিলো বাংলার জমিদারেরা। কখনো চাষীদের সর্বনাশ হবে এই ধুয়ো তুলে, কখনো জাত নষ্ট হবে এই আশঙ্কার ঢেউ তুলে, কখনো বা তাঁতী, কুমোর, স্যাকরাদের বন্ধু সেজে তাদের সর্বনাশ হবে এই অজুহাতের দোহাই দিয়ে। গোঁড়া হিন্দুয়ানির ও জমিদারদের মুখপত্র "সমাচার চন্দ্রিকা" পুরাতন সামাজিক কাঠামোকে মিথ্যে ও কুসংস্কারের ঠেকা দিয়ে বাঁচাবার জন্যে মরিয়া হয়ে লেগে পড়েছিল। সেই সব অভিসন্ধিমূলক মিথ্যে ও কুসংস্কারের কুয়াশাকে যুক্তির সূর্যালোকে দূর করলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রথম চিঠিতেই তিনি দেশের লোককে জানিয়ে দিলেন যে "সমাচার চন্দ্রিকা"-প্রচারিত খবর যে টাউন হলের সভায় ভারতীয়দের মধ্যে থেকে শুধু দ্বারকানাথ আর প্রসন্নকুমার ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন এই খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যে। আরো অনেক সম্ভ্রান্ত ভারতীয়েরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীরও অনেক বড়ো বড়ো আমলারা হাজির ছিলেন সেই মিটিংয়ে। খোদ প্রিন্সেস্ সাহেব, গভর্মেণ্টের সেক্রেটারী ও পাউডেন্ সাহেব, কলেক্টর ও নিমক-এজেণ্ট সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এঁদের দুটি ছাড়াও আরো অনেক সাহেব ছিলেন সেই সভায়। এই সভাটিকে একটি বিশেষ দলের দলীয় সভা বলে লোক ঠকাবার যে প্রয়াস "সমাচার চন্দ্রিকা" করছিলো, সেই অপচেষ্টাকে তথ্যের ধাক্কায় ধূলিসাৎ করে দিলেন দ্বারকানাথ। তারপরে সুরু করলেন তিনি "সমাচার চন্দ্রিকা"-র যুক্তিগুলির উত্তর দিতে। "সমাচার চন্দ্রিকা"-র সম্পাদক প্রশ্ন করেছেন—এই দরখাস্তের ফলে দস্তখতকারীদের কি সুবিধে হবে? দ্বারকানাথ তার উত্তরে বলছেন—'চন্দ্রিকা-সম্পাদক নীলকুঠিতে কাজ করে ও সেই জায়গারই বাসিন্দে এমন যে কোনো রায়তের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন। তাহোলো নীলকুঠি পত্তন হবার আগে ও সেই নীলকুঠিতে কাজ করবার আগে সেই রায়তের

কি অবস্থা ছিলো ও নীলকুঠিতে কাজ করবার পর তার কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে সে সম্বন্ধে জানতে পারবেন ও তার ফলে চন্দ্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ের ভ্রান্তি দূর হবে।' এই উক্তিটুকু করেই দ্বারকানাথ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তথ্যপূর্ণ বিবরণ দেবার কাজে লেগেছেন। তিনি বলছেন—'ইয়োরোপীয়দের বসবাসের ফলে ও তাদের চাষবাসের দরুন জমির দাম বেড়ে যাবে। সকলেই জানে যে যেখানে অধিবাসীদের সংখ্যা বেড়ে যায়, সেখানে বাস্তুভিটের জমির খাজনাও বৃদ্ধি পায়। তার ফলে জমিদার, ইজারাদার ও কুটীকিনাদারেরা লাভবান হয়। তাছাড়া বেশী জমি চাষে আসার ফলে চাষীরা বেশী মজুরী পাবে। সকলেই জানেন যে যশোর জেলায় ও তার কাছাকাছি জায়গাগুলিতে নীলকুঠিগুলি স্থাপিত হওয়াতে যেসব মজুরেরা এই কুঠিগুলিতে কাজ করে, কর্ম-নৈপুণ্যের দরুন তাদের মজুরী আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। আগে মাসিক মজুরী ছিলো এক টাকা থেকে দেড় টাকা, এখন মজুরী হয়েছে মাসে সাড়ে তিন টাকা থেকে চার টাকা। একটু চেষ্টা করলেই জানা যাবে যে যেসব জেলায় ইয়োরোপীয়েরা গিয়ে বাস করছে সেখানেই জেলার অধিবাসীরা বেশ ভালো ভাবে, এবং কোনো কোনো জায়গায় খুব ভালো ভাবে জীবিকা অর্জন করতে পেরেছে।' "সমাচার চন্দ্রিকা" ছিলো জমিদারদের কাগজ। তাই জমিদারদের জন্যে হাহুতাশে ভরা ছিলো 'চন্দ্রিকা'-র পৃষ্ঠাগুলি। অবিশ্যি চাষীদের দুঃখে "চন্দ্রিকা"-র পৃষ্ঠাগুলি যে মাঝে মাঝে সপ্‌সপে হয়ে উঠ্‌ছিলো না তা নয়, কিন্তু সেটি মেকী কান্নার মতলবী চোখের জলে। "চন্দ্রিকা"-র এই হাহুতাশ ও চোখের জল—এই দুমুখো দরদের জবাব দিলেন দ্বারকানাথ। তিনি অকাট্য তথ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন যে ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে বসবাসের ফলে ও সেই সব অঞ্চলে তারা চাষবাস সুরু করায় বহু লোক এসে জুটেছে নীলকুঠির কাজে, ফলে জমির দাম বেড়ে গেছে সেই সব অঞ্চলে। জমিদারেরা ও ইজারাদারেরা এই কারণে ভিটের জমির খাজনা আগের চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছে এই সব অঞ্চলে। ইয়োরোপীয় গ্রামাঞ্চলে বাস করায় ও কৃষিকার্যে হাত দেওয়ায় জমিদারেরা ক্ষতিগ্রস্ত তো হয়ই নি, বরঞ্চ লাভবান হয়েছে। আর চাষীরা, তারাও ক্ষেত-মজুরী করে আগে যে মজুরী পেতো তার দ্বিগুণের চেয়েও বেশী পাচ্ছে নীলকুঠিতে কাজ করে। তারাও তাই লাভবান হয়েছে ইয়োরোপীয়েরা গ্রামাঞ্চলে বাস করায়। শুধু তাই নয়, দশশালা বন্দোবস্তের পর তালুকগুলির দাম একেবারে পড়ে গিয়েছিলো। দুতিন বছরের ফসলের মূল্যে তালুকগুলি বিক্রী হয়ে যাচ্ছিল। সেই তালুকগুলি এখন কুড়ি পঁচিশ বছরের ফসলের দামে, কোথাও বা ত্রিশ বছরের ফসলের দামে বিক্রী হচ্ছে। দ্বারকানাথ প্রশ্ন করছেন—কেন এই তালুকগুলি এখন এতো বেশী দামে বিকোচ্ছে? আর নিজেই তার জবাব দিচ্ছেন—'ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে বাসের ফলে, এদেশের চাষীদের ও পাকা-মাল-উৎপাদনকারীদের ইয়োরোপীয়েরা শিক্ষা দেওয়ার ফলে, উন্নত প্রণালীতে নীলের ও অন্য অন্য জিনিসের চাষ করার দরুন এবং ইয়োরোপীয়েরা বেনামীতে জমি কেনে তার দরুন জমির দাম এতো বৃদ্ধি পেয়েছে।'

তারপর দ্বারকানাথ আরো একটি মূল্যবান তথ্য আমাদের সামনে হাজির করছেন। তাঁর চিঠি থেকে আমরা জানছি যে নীলকুঠির ইয়োরোপীয় মালিকেরা বছরে দু কোটি টাকা নীল-চাষের জন্যে ব্যয় করছে আর এই টাকার বেশীর ভাগটা পাচ্ছে এদেশের লোক। এর ফলে নীলকুঠির আশেপাশের চাষীরা ও মধ্যবিত্তরা যে সুযোগ পেয়েছে তাদের অবস্থা ফিরোবার, কস্মিনকালে সে সুযোগ তারা পায়নি। কলকাতার দিকে আঙুল দেখিয়ে দ্বারকানাথ বলছেন—"চন্দ্রিকা"-র কাছে কি এটাও স্পষ্ট নয় যে কলকাতায় জমির ও

বাড়ীর দাম কি রকম বেড়েছে? তাছাড়া কলকাতার বাসিন্দেরা জেলার লোকদের চেয়ে বুদ্ধিতে, ব্যবসার অভিজ্ঞতাতে কিরকম এগিয়ে গেছে ও তাদের আগেকার নীচ অভ্যাস ত্যাগ করে তারা গাঁয়ের লোকের চেয়ে কতো অগ্রসর হয়েছে? কিছু বদমত্‌লবী ও হিংসুটে লোক আছে, তারা ছাড়া আর সকলেই ইয়োরোপীয়দের কর্ম-তৎপরতা ও পরিশ্রমের ফলে কি উন্নতি সাধিত হয়েছে সেটা জানে, ও যাতে আরো উন্নতি হয় তা আন্তরিক ভাবে চায়।"

"চন্দ্রিকা"-সম্পাদক জাতের কথা তুলে লোকদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজরা গ্রামাঞ্চলে বাস করলে ও চাষবাস সুরু করলে গ্রামবাসীদের জাত যাবে এই ধুয়ো তুলে 'চন্দ্রিকা'-সম্পাদক গোঁড়ামিকে খুঁচিয়ে তোলবার খেলা সুরু করেন। এই চতুর নোংরামির যুক্তিহীনতা দেখিয়ে দেন দ্বারকানাথ। তিনি বললেন—'ইয়োরোপীয়রা তো অনেক বৎসর থেকে কলকাতায় বাস করছে, কোনো হিন্দুর কি সেই কারণে জাত গেছে? তাহোলে ইয়োরোপীয়দের সংগে মেশার জন্যে মফস্বলের হিন্দুদেরই বা জাত যাবে কেন?' "চন্দ্রিকা"-সম্পাদক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে ইয়োরোপীয়রা চাষবাস সুরু করলে আমাদের কৃষিজাত ফসলের ঘাট্‌তি হবে। এই নির্বুদ্ধি মন্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে দ্বারকানাথ বললেন—'এটা একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। কেননা নিপুণ ও একটানা তত্ত্বাবধানের ফলে কৃষিজাত ফসল অনেক বেড়ে যাবে; আর এ বিষয়ে ইংরেজদের কর্ম-তৎপরতা সর্বজন-বিদিত।'

"চন্দ্রিকা"-সম্পাদকের মোক্ষম যুক্তি যে ইয়োরোপীয়রা মফস্বলে বসবাস করলে 'জমি নিয়ে ইয়োরোপীয়দের সংগে এদেশের লোকদের ঝগড়া লেগেই থাকবে', তার উত্তরে খুব শান্ত শ্লেষের সংগে দ্বারকানাথ বললেন—'এদেশের লোকদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া কবেই বা এতো কম ছিলো যে ইয়োরোপীয়রা এদেশে বাস করলে ঝগড়া সুরু হবে এই আশঙ্কা "চন্দ্রিকা"-সম্পাদক করবেন?' এইভাবে দ্বারকানাথ তাঁর প্রথম চিঠিতে "সমাচার চন্দ্রিকা"-র সব যুক্তির উত্তর দিলেন। তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে দ্বারকানাথ আরো অনেক তথ্য ও যুক্তি পেশ করলেন দেশের লোকের সামনে।

"চন্দ্রিকা"-সম্পাদকের ১২ই পৌষের চিঠিতে যে সব যুক্তি ও অভিযোগ ছিলো সেগুলির উত্তর দ্বারকানাথ তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে (১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখের চিঠি) দিলেন। "চন্দ্রিকা"-সম্পাদক অভিযোগ করেছিলেন যে ইয়োরোপ থেকে সুতোর আমদানী হওয়াতে এদেশে যে স্ত্রীলোকেরা সুতো বিক্রী করতো তাদের দুর্দশার শেষ নেই, আর ইয়োরোপীয়েরা কলকাতা সহরে ময়দার কল বসানোর ফলে যারা ময়দা বিক্রী করতো তাদেরও চরম দুর্দশা হয়েছে। এর উত্তরে দ্বারকানাথ বললেন যে যতো দুর্দশার কথা "চন্দ্রিকা"-সম্পাদক বলেছেন, দেশের লোকের ব্যবসা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবার কথা বলেছেন, সেরকম কিছু ঘটেনি। এখনো মেয়েরা সুতো বিক্রী করছে, আর ময়দা ফিরি করছে ফিরিওয়ালারা।

"একমাত্র যে পরিবর্তন ঘটেছে সেটি হচ্ছে এই যে এই সব জিনিস পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরী হওয়ায় এদের দাম কমে গেছে। এটা ক্ষতিকর তো নয়ই বরঞ্চ এটার ফল শুভকর বলে গণ্য করতে হবে। আগে গরীবেরা ভালো কাপড় কামনা করতো কিন্তু কেনা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এখন ভালো কাপড়ের দাম কমে যাওয়াতে গরীবেরা তা কিনতে পারছে। আটা সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। যখন বহু লোক প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হচ্ছে, তখন কিছু লোকের কিছু ক্ষতি হবে এই আশঙ্কা করে দুঃখ প্রকাশ করার অর্থ হচ্ছে সমাজের অমংগল কামনা করা।" (বড় অক্ষর আমার—সৌম্যেন্দ্রনাথ)

এই কথাগুলি দ্বারকানাথের আসল চরিত্র আমাদের সামনে চমৎকারভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছে। নিজে জমিদার ও ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও দ্বারকানাথ সাধারণ মানুষের স্বার্থকে জমিদার ও ব্যবসায়ীর স্বার্থের চেয়ে অনেক বড়ো বলে মনে করতেন। জিনিসের দাম চড়া থাকলে ব্যবসায়ীদের লাভ আর জিনিসের দাম কমলে সাধারণ মানুষের কল্যাণ—দ্বারকানাথ সাধারণ মানুষের কল্যাণকে কতিপয়ের লাভের চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়েছিলেন। দ্বারকানাথের ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয়ও এই চিঠিতে আমরা পাই। কিছু লোককে ব্যথা না দিয়ে যে কোনো গোড়া-ঘেঁসা পরিবর্তন সম্ভব নয়, এই বোধ দ্বারকানাথের ছিলো। কিছু লোকের এই অবশ্যম্ভাবী দুঃখকে বহুলোকের সুখ-সৃষ্টির জন্যে অবিচলিত চিত্তে স্বীকার করে নিতে হবে—ইতিহাসের গতির এই নিয়ম দ্বারকানাথ জানতেন ও সেটি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্তও করেছেন—"যখন বহুলোক প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হচ্ছে, তখন কিছু লোকের কিছু ক্ষতি হবে এই আশঙ্কা করে দুঃখ প্রকাশ করার অর্থ হচ্ছে সমাজের অমঙ্গল কামনা করা।"

শিল্প-বিপ্লবের সূচনায় কলকারখানা প্রবর্তনের সময় কুটীর-শিল্প ধ্বংস হতে বাধ্য। ফলে জিনিস তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুটীর-শিল্পে যে সংখ্যায় জিনিস তৈরী হোতো তার তুলনায় অনেক বেশী জিনিস উৎপন্ন হবে, ও অনেক বেশী জিনিস তৈরী হওয়ার ফলে জিনিসের দামও কমে যাবে আগের তুলনায়। ফলে কুটীর-শিল্প সংকুচিত হতে বাধ্য ও যারা কুটীর-শিল্পের দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে তারা অনেকে বেকার হবে এটাও অনিবার্য। এই শিল্প-বিপ্লবে সমাজের কিন্তু কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ নেই। কিছু লোকের দুঃখের মূল্যে অগুন্‌তি লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে মানবসমাজ। শিল্প-বিপ্লবের ফলে জিনিসের মূল্য কমে যাওয়ায় সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নিছক প্রয়োজনের চাহিদা মিটিয়ে প্রকৃতি মানুষকে যে পশু-জগতের বাসিন্দা করে রেখেছিলো এতোদিন, তার থেকে মুক্তি পাবার পথ মানুষ সূচনা করে। ভারতবর্ষের শিল্প-বিপ্লবকে দ্বারকানাথ অতি সচেতনতার সঙ্গে আবাহন জানিয়েছেন ও কিছু লোকের দুঃখে বিগলিত হয়ে বহুলোকের সুখ-দায়ক ও মানবসমাজের অগ্রগতির সহায়ক এই শিল্প-বিপ্লবকে বাধা দিতে চেষ্টা তো করেনই নি, বরঞ্চ সর্বতোভাবে তার সমর্থন করেছেন দ্বারকানাথ। এইখানেই দ্বারকানাথের অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব।

ব্যবসায়ীদের তীব্র কশাঘাত করে দ্বারকানাথ বল্‌ছেন :—"ব্যবসায়ীদের প্রাণের ইচ্ছে এই যে যেসব জিনিস নিয়ে তারা কারবার করে সেসব জিনিস যেন কম পরিমাণে তৈরী হয়, যাতে করে তাদের দাম বেড়ে যায়; কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী লোকের এই অভিপ্রায় নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় নয়। যেমন এদেশে যে নানা ধরনের বিলিতী মুদ্রা-যন্ত্র আমদানী করা হয়েছে ছাপার কাজের জন্যে, তাদের কথা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মুদ্রা-যন্ত্র আমদানীর জন্যে যারা বই নকল করে সেই সব নকলনবীশদের কিছু অসুবিধে নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু তাই বলে কোনো বুদ্ধিমান লোকই বিলীতি মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের দ্বারা যে মহৎ উপকার সাধন করা হয়েছে—অনেক লোকের জীবিকার সংস্থান করেছে বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও শিক্ষা বিস্তার করে—সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না।" কলকারখানার পত্তন যে নিছক অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচনা করে না, সাংস্কৃতিক উন্নতির সম্ভাবনাও যে সৃষ্টি করে শিল্প-বিপ্লব, এ ধারণা দেখা যাচ্ছে দ্বারকানাথের ছিলো।

"চন্দ্রিকা"-সম্পাদক আবার দরিদ্র-গত-প্রাণ জন-দরদী সেজে হাহুতাশ সুরু করলেন।

রামমিস্ত্রী, ছুতোর, স্যাকরা, দর্জি ও মাঝিদের কথা তুলে "চন্দ্রিকা"-সম্পাদক লিখলেন—'এই পাঁচ ধরনের কাজ-করনেওয়ালা লোকদের লাভ অনেক কমে গেছে এইসব কাজে ইয়োরোপীয়দের প্রতিস্পর্ধিতার ফলে।' দ্বারকানাথ তার উত্তরে বললেন যে, "চন্দ্রিকা"-সম্পাদক মহাশয় আসল ব্যাপারটা বোঝেন নি, তিনি শুধু ঘটনার উপর উপর আঁচড়েছেন। "আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে যখন ইয়োরোপীয়রা বহু সংখ্যায় কলকাতায় এসে নানা ব্যবসা সুরু করে দিলো, তখন এ দেশের লোকেরা সেই সব ব্যবসা শিখতে সুরু করলো এবং সেই সব কাজে নৈপুণ্য লাভ করবার পর বেশ মোটা মাইনেতে ইয়োরোপীয়রা তাদের নিযুক্ত করলো। ইতিপূর্বে কোনো প্রতিস্পর্ধিতা না থাকায় দুএকজন লোক যারা কাজ ভালো করে শিখেছিলো তারাই ব্যবসাটির একচেটিয়া অধিকারী হয়ে প্রভূত লাভ করেছিলো।" আগে দু চারটি লোক ব্যবসার একচেটিয়া মালিক হয়ে অপরিমিত লাভ করতো, এখন কতিপয়ের সেই অসম্ভব লাভ লোটা বন্ধ হয়েছে বটে কিন্তু বহুলোক ব্যবসা শিখে আগে যে অসম্ভব কম মজুরীতে তারা কাজ করতো এখন তার চেয়ে অনেক বেশী মজুরীতে তারা কাজ করছে—তাঁর এই মতের যথার্থতা প্রমাণ করবার জন্যে দ্বারকানাথ তখন অর্থনৈতিক অবস্থার তথ্য হাজির করলেন। কলকাতার বিভিন্ন মহল্লায় যতো রাজমজুর বাস করে তাদের সংখ্যা বেড়েছে। কতো ছুতোরের, স্যাকরার ও দর্জির দোকান খোলা হয়েছে কলকাতায়। মাঝিদের সংখ্যায় বেড়ে গেছে। এদের যে শুধু সংখ্যাই বেড়েছে, আর এরা কাজ পাচ্ছে না, বেকার হয়ে রয়েছে তা নয়। এরা যদি বেশীর ভাগ বেকার থাকতো তাহোলে তো এদের মজুরীর হার কখনো বাড়তো না। দ্বারকানাথ বলছেন :—"এই সহরের মজুরদের সংখ্যা সহজে অনুমেয় নয়, কিন্তু এদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও দর্জিদের মজুরীর নিম্নতম হার হচ্ছে মাসে সাত টাকা থেকে আট টাকা আর উর্ধ্বতম মাসিক মাইনে ষোলো টাকার কম নয়। পনেরো বছর আগে তাদের মাসিক বেতনের হার ছিলো নিম্নতম চার টাকা আর উর্ধ্বতম আট টাকার বেশী নয়। আগে ছুতোরেরা মাসে তিন চার টাকা রোজগার করতো, এখন ইয়োরোপীয়রা এই ব্যবসা সুরু করাতে কিছু কিছু ছুতোর এখন মাসে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করছে। স্যাকরা, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতির বেলাতেও সেই একই কথা।"

এই সব তথ্য পরিবেশন করবার পর দ্বারকানাথ আবার যুক্তি দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন—"ব্যাপারটা হচ্ছে এই, যে আগে সমস্ত ব্যবসাটা দুচারটি লোকের কবলস্থ ছিলো। তারাই প্রচুর মুনাফা লুটতো। এখন ব্যবসাগুলি সাধারণের প্রতিস্পর্ধিতার আওতায় আসায়, ব্যবসাক্ষেত্রে অসংখ্য প্রতিস্পর্ধী দেখা দিয়েছে। অবিশ্যি এরা প্রত্যেকে আগের মতো লাভ করতে পারবে না নিশ্চয়, কিন্তু ইয়োরোপীয়দের ব্যবসার ফলে তারা সকলেই কাজ পেয়ে থাকে এবং আগের চেয়ে বেশী রোজগারও করে।"

ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার দূর হলে বহু লোক ব্যবসা করে লাভবান হবে, জিনিসের দাম কমে গেলে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হবে, মজুরদের মজুরীও বাড়বে কলকারখানা বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে কুসংস্কার দূর হবে এবং শিক্ষার বিস্তার হবে—এই মত দ্বারকানাথ বারবার ব্যক্ত করেছেন তাঁর বক্তৃতায় ও লেখায়। নতুন নতুন বাজার দখল, জিনিসের দাম কমিয়ে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ—এসব প্রয়োজন ক্যাপিটালিষ্ট যান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর সম্প্রসারণের জন্যে। ভারতের বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লবের সহায়করূপে সেদিন দেখা দিয়েছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাঁর বন্ধু রামমোহন রায়।

[আগামীবারে সমাপ্য]

কনখল

মনীশ ঘটক

আসামের সোকাতুরা চা বাগিচা থেকে যে রাস্তা শাহ্‌জলালের দর্গার পাশ কাটিয়ে শিলেট সহরে এসে ঢুকেছে, এক বর্ষার ঘটাঘন ঘোর সন্ধ্যায় জনৈক অশ্বারোহী যুবক সেই রাস্তা ধরে ধীর কদমে সহরের দিকে অশ্বচালনা করছিলেন। সেটা ইংরেজী সন ১৯১১, হ্যালীর ধূমকেতুর আবির্ভাব ও ইংলণ্ডরাজ সপ্তম এডোয়ার্ডের মৃত্যুর বছর।

দূরে পুলিশ হাসপাতালের টিলার আলো, মাঝখানে পোলো খেলার ময়দান, একটু বাঁয়ে চোখ ফেরালে সিভিল সার্জনের টিলা, সব যুবকের চোখে পড়ছে। পুলিশ হাসপাতালের টিলাটি বড়ো, সেখানে হাসপাতাল ছাড়াও ডাক্তারের বাংলো এবং যুবকটির বাংলো আছে। যুবতী স্ত্রী একমাত্র শিশুপুত্র নিয়ে উৎকণ্ঠিতা হয়ে প্রহর গুণছে। যুবক উদ্বিগ্ন বোধ করলেও ক্লান্ত ঘোড়াকে আর ছোটাতে চাইছিলেন না। ঘোড়া মন্থর পায়ে যে দুলকীতে চলছিল তারই তালে গা ছেড়ে দিয়ে যুবক সওয়ার হয়ে ছিলেন। পোলো ময়দানের মোড় নিতে ঝাড়া আধ ঘণ্টা লাগবেই, কোনো চারা নেই।

ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে বিদেশী গৌরব রবি অস্তমিত হবার প্রায় পাঁচ দশক আগেকার কাহিনী। যুবক একজন হালফিল ম্যাজিস্ট্রেট, বাঙালী। নাম হৃষীকেশ বাগচি।

তখন দূর দূরান্তর থেকে শাহ্‌জলালের দর্গার বাসিন্দা অগণিত জালালী কবুতর ঘরে ফিরে আসছে দিক অন্ধকার করে। সমস্ত দিনমান বিশ্রামহৃষ্ট অসংখ্য বাদুড় দর্গার ভেতর বাইরের গাছগুলোর মাথা থেকে ঝট্‌পট্‌ করে ডানা মেলছে রাত চরবার ধান্দায়। দূরে, বহু দূরে, লাকাতুরা চা বাগিচা বরাবর যে সীমাহীন হাওড়, তাতে লক্ষ লক্ষ আলেয়ার নৃত্যলীলা সুরু হয়েছে—ওরা নাকি পথহারা পথিকদের পথ দেখাবার ছল করে ভুলিয়ে নিয়ে হাওড়ের গভীর পাঁকে ডুবিয়ে মারে। ওপরে, নীচে, আশেপাশে, জোনাকীর খই ফুট্‌তে সুরু হয়েছে।

যুবক রাশ ঢিল দিয়ে ঘোড়ার ওপর অন্যমনস্কভাবে বসে ছিল। অভ্যস্ত পথে ঘোড়া আপনিই পথ চিনে চলেছিল। ডাহিন বাঁক নেবার সময় অদূরে অবস্থিত মেক্‌লা গ্রাম থেকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল কানে আস্‌তে প্রথমে ঘোড়া, পরে সওয়ার কান খাড়া করে শুন্‌ল। যুবকের ঘনকৃষ্ণ পুরুষ্টু একজোড়া গোঁফ, দুধার ছুঁচোলো। অভিনিবেশের দরকার হলেই একটু মাথা কাৎ করে বাঁ হাতে গোঁফে চাড়া দেওয়া অভ্যাস। এখনো তাই দিলেন। কোলাহল অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট, ক্রমশঃ স্পষ্টতর হল। মনে হল যেন দরগার ইমাম সাহেবের দৃপ্ত কণ্ঠের জোরদার হুকুমজারীর আওয়াজ কানে এল। কিছুক্ষণ পর অবোধ্য গুঞ্জন তুলে সোরগোল মিলিয়ে গেল। ঘোড়া থম্‌কে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রেকাব সমেত বাঁ পা ঘোড়ার পেটে ঠেকাতে ঘোড়া আবার চলতে সুরু করল। যুবকের ভ্রূকুঞ্চন মিলিয়ে গেল না, অনিশ্চিত একটা দুশ্চিন্তা সারা পথ সাথী হয়ে রইল।

বাংলোয় পেঁছবার সাথে সাথেই ঘোর বর্ষণ সুরু হল। সহিস ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলে চলে গেল। যাবার আগে যুবক ঘোড়ার ঘাড়ে গর্দানে আদর করে দুটো চাপড় দিলেন,

কপাল থেকে নাক পর্যন্ত সস্নেহে হাত ঘষ্‌লেন, ঘোড়াও ঘাড় বেঁকিয়ে যুবকের কাঁধে মুখ বুলিয়ে দিল, ঠোঁট ফাঁক করে দাঁত বার করে তৃপ্তির হ্রেষাধ্বনিও করল। যুবক বললেন,

—যাও কাঞ্চন, আরাম করো গে।

ঘোড়ার নাম কাঞ্চন। পঞ্চতিলক ঘোড়া। গায়ের রং সোনালী, কপাল থেকে নাক বরাবর খাড়া সাদা তিলক, চার পায়ের খুরের গোড়া সাদা। প্রবাদ, পঞ্চতিলক ঘোড়া বড়ো পয়মন্ত।

যুবকের হাঁটবার কায়দা দৌড়ের সমগোত্রীয়। তিন লাফে সিঁড়ি ভেঙে বাংলো মুখী ছুট দিলেন তিনি।

হলঘরে ডিট্‌মারের ঝোলানো বাতির উজ্জ্বল প্রভাকে, চাবি ঘুরিয়ে উজ্জ্বলতর করে দিলেন নিভাননী। দরজা খুলে, এক পাশে সরে দাঁড়ালেন। যুবক ভেতরে পা দিয়ে টুপির দাঁড়ে টুপি খুলে রেখে নিভাননীর মুখচুম্বন করে গোসল কামরার দিকে চলে গেলেন। পাশ থেকে গুরু গম্ভীর গলায় ন'বছরের ছেলে কনখল বলল,

—দরজা বন্ধ করে দাও মা, জল আসছে ঘরে।

মুখচুম্বনটা ছেলের চোখ এড়ায় নি টের পেয়ে নিভাননীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। বললেন,

—কংখ্‌, তুই বুঝি এইখানেই ঘুর ঘুর করছিলি?

হৃষীকেশের ছেলে কনখল। এক বন্ধু ঠাট্টা করে বলেছিলেন, পরেরটির নাম রেখো লছমনঝোলা, মেয়ে হলে জাহ্নবী।

কনখল বলল,—ঘোড়ায় চড়ে বাবা যখন ওই নীচের রাস্তা থেকে টিলার ওপর ওঠেন, আমার খুব ভালো লাগে দেখতে।

তারপর আবার কি ভাব্‌লে। ভেবে, মাথা নেড়ে বলল,

—না, শুধু তাই নয়। ওই দূরে দর্গার বাঁক থেকে এত্তোটুকু ছোট্ট ফোঁটার মতো সাদা টুপিওলা বাবা, বাড়ীর কাছে আসতে আসতেই কতো বড়ো হয়ে যান, সেইটে দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।

নিভাননী ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন,

—বাবা যে সত্যিই খুব বড়ো, তাই, বয়েস হলে বাবার কনাও বাবার মতো বড়ো হবে, নারে কংখ্‌?

কনখলকে মা ডাকেন কংখ্‌ বলে। বাবা বলেন কনা।

হৃষীকেশ গোসলখানা থেকে ছাপছন্দ হয়ে পাজামা পাঞ্জাবী পরে ঘরে এসে ঢোকেন। এই একটি হলঘরই তাঁদের বসবার ও খাবার কামরা। ঘরের মাঝামাঝি এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল পর্যন্ত লম্বা কাঠের রড, তাতে পেতলের আংটা ঝোলানো বড়ো বড়ো ক্রোটন আঁকা ক্রেপের পরদা। মানুষের মাথা থেকে উঁচু, ফলে একখানা ঘরই পরিষ্কার দুখানা ঘর হয়ে গেছে।

বসবার দিকের সব আসবাব শিলেটি মুলি বাঁশের ও বেতের। একখানা বড়ো পা ছড়ানো আরাম কেদারা, আর খান তিনেক ছোটো, তবে অনারামের নয়। মাঝখানে গোল তেপাই। তাতে একটি ফুলদানে একঝাড় বেগুনি রং-এর মেহেদী ফুলের গোছার ভেতর গুটিচারেক সোনালী মুচুকুন্দ চাঁপা। কি তীব্র গন্ধ ঐ চাঁপার—বাবুর্চি রহমৎ বলে ও গন্ধে মশা পালায়।

তেপাইয়ের তলায় একটা থাক আছে। তাতে দু-তিন দিনের ডাক সংস্করণের বেঙ্গলী, ইংলিশম্যান ও পাঁচকড়ি বাঁড়ুজ্যের "নায়ক"।

নিভাননী যথাসম্ভব কুশল বিস্তার করে বেতের চেয়ারগুলো অধিকতর আরামের করে নিয়েছেন। ঘরের এক কোণে উপুড় করে বসানো একটি চায়ের বড় প্যাক বাক্সো। পুরোনো ঢাকাই জামদানীর আঁচলা কেটে তার কভার করেছেন নিভাননী। তার ওপর বসানো ইয়া বড়ো চোংওয়ালা ফনোগ্রাফ। ওতে যে সঙ্গীতমুগ্ধ নিবিষ্ট চিত্ত কানখাড়া করা কুকুরের ছবিটা আছে, ওটা কনখলের বড়ো প্রিয়। চোং-এর ভেতর থেকে যারা গান গেয়ে, কথা বলে যায়, তাদের সম্বন্ধে কনখলের অদম্য কৌতূহল। মা বাবা থাকেন বলে গানের সময় শুধু উঁকিঝুঁকি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করা চলে না। দুপুরে মা ঘুমুলে, বাবা আপিস গেলে ও হাত গলিয়ে দেখেছে, তখন কেউ থাকে না ওখানে।

ঘরের আর এক কোণে ডোয়ারকিনের জাপানী টেবিল বাজা। ভাঁজ করলে একটা তোরঙ্গেই এঁটে যায়। সামনে সাইজমাফিক্ বাঁশ ও বেতের উঁচু মোড়া। বাবা ঐটেতে বসে দুহাত চালিয়ে বাজান, গানও করেন। সময় সময় কনখলের ডাক পড়ে এক সাথে গলা মিলিয়ে গান করবার। কনখল মোটে ঘাবড়ায় না, সমানে বাবার সাথে গলা মিলিয়ে গান ধরে,

'তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে'

নিভাননী হেসে ফেটে পড়েন। কনখল বোঝে সেইই হাসির খোরাক জুগিয়েছে। বোধ হয় গলা মেলেনি, না হয় এ বেসুর হয়েছে। কিন্তু বাবা বলেন,

—বেশ হচ্ছে, বেশ হচ্ছে,—আচ্ছা আবার—

বাইরের দরজা দিয়ে হল ঘরে ঢুকতেই দুপাশে দুটো দাঁড়। একটা টুপি, ছড়ি, বর্ষাতির, আর একটা বন্দুকের। যোলো আর বারো বোরের দুটো দোনলা বন্দুক। টিপের বেড়ের মধ্যে সরু শিকল দিয়ে দাঁতের সাথে তালা মারা।

কনখলের জাগ্রত কৌতূহল ওই বন্দুক দুটি ঘিরে। ওর নলে কি রহস্য আছে, ও ভাবে। বাবা যে কি করে আকাশ থেকে উড়ন্ত পাখী মাটিতে নামিয়ে আনেন, একটু আঙুলের চাপ, গুড়ুম আওয়াজ, আর নল দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া বার করে, এ ওর চির বিস্ময়।

খানা কামরায় ডাক পড়তে দেরী আছে। খাবার তৈরী হবার পর টেবিলে সাজানো হলে বুড়ো রহমৎ ছোট্ট একটা টেবিল ঘণ্টি টুং করে বাজিয়ে দেবে, তখন বাবা মা উঠবেন। এখন বসবার ঘরে বিশ্রাম, গল্পগুজব, এই সব।

কনখল এখনো স্কুলে ভর্তি হয়নি। এইবার হবার কথা হচ্ছে। কিন্তু বাংলা আর সহজ ইংরেজি পড়বার মতো বিদ্যা মা বাবার কাছে পেয়েছে। ওর অনেক বই। রঙীন ছবিওয়ালা বাইবেলের নানান গল্প, ঠাকুরমার ঝুলি, ছোট্ট রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, এগুলো বারবার পড়েও পুরোনো হয় না।

থামের ওপরে ঘর, তাতে ডেলিলা আছে। অন্ধ স্যামসন তার সমস্ত গায়ের জোর দিয়ে সেই থাম ভেঙে ফেলছে, মরবে সবাই, জেনেও। স্যামসনের গায়ের মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠেছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে, অথচ মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। কনখল অনেকক্ষণ ধরে দেখে, আর ভাবে গায়ে কত জোর থাকলে অমনি করে একটা বাড়ী ভেঙে ফেলা যায়। ডেলিলা ভালো মেয়ে নয়, তার জন্যেই স্যামসনের সব কষ্ট।

ঠাকুরমার ঝুলির 'হটর হটর পবনের না, মণিমালার দেশে যা' ছবিটাও ওর প্রিয়। আর ছেলেদের মহাভারতের ঘটোৎকচ বধের ছবিটা, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আঁকা। তবে ওর সবচেয়ে প্রিয় ছবি হোলো মার বড় রামায়ণের 'শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্রশাসন'।

বাংলা বই, বড়োদেরই হোক, আর ছোটোদেরই হোক বুঝুক, আর না বুঝুক, ও পড়ে যায়। খানকতো বই আছে বারবার পড়েও আগ্রহ মেটে না ওর। বিষাদসিন্ধু, কঙ্কাবতী, বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর ইন্দিরা। বিষাদসিন্ধু পড়ে কেঁদেছে, কঙ্কাবতী পড়ে মুগ্ধ হয়েছে, ইন্দিরা পড়ে স্বপ্নের জাল বুনেছে। 'ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে, বাঁশতলাতে জল,—আয় আয় সই, জল আনিগে, জল আনিগে চল্'। নিজের অগোচরে এ বোধ ওর মনে উঁকি দিয়েছে, যে কথা দিয়েও ছবি আঁকা যায়।

এসব ছাড়া, এক পাদরী সাহেব সেদিন মথি লিখিত আর লুক লিখিত সুসমাচার দিয়ে গিয়েছিল। আদ্যন্ত পড়তে ও ছাড়েনি, কিন্তু ভালো লাগেনি। আড়ষ্ট ভাষা, মনে দাগ কাটে না।

মা একখানা মাসিক পত্র নেন, "প্রবাসী"। কনখলের নিজের নামেও একখানা মাসিক পত্র আসে, "সখা ও সাথী"। "প্রবাসী"তে বড় বড় মেয়েদের ছবি ছাপা হয়, দেখে, ঠিক ভালো লাগা নয়, ভালো লাগার শিহরণের মতো একটা অনুভূতি ওর মনে জাগে। কেন, তা সে বলতে পারে না।

"সখা ও সাথী" পড়ে আনন্দ পায় কনখল। লিভিংস্টোনের জীবনকাহিনী পড়ে মুগ্ধ হয়। ফনোগ্রাফের প্যাকবাক্সের এক পাশে হাসিরাশি, জীবজন্তু, টমকাকার কুটীর আর মণিপুরের টীকেন্দ্রজিতের কাহিনী, এই সব বই রাখা আছে। ওগুলো ওর পড়া হয়ে গেছে।

মা বাবা গল্প করছেন। কনখলের কান খাড়া থাকে, বাবা কি বলছেন শোনবার জন্য। বাবা যখন হাত নেড়ে গল্প করেন, কনখল নিবিষ্ট মনে দেখে। মাঝখানে হঠাৎ উঠে গিয়ে শোবার ঘরের বড়ো আয়নার সামনে অমনি করে হাত নাড়ে। হাত নাড়া শেষ করেই ওপরের ঠোঁটে হাত বুলোয়। যে গোঁফ এখনো ওঠেনি, তাতেই চাড়া দেয়। দিয়ে একটু মৃদু হাসে।

ফিরে এসে দেখে বাবা পায়চারী করছেন। মার মুখে মধুর তৃপ্তির হাসি। মা হালের সংখ্যা "প্রবাসী" খুলে বসে আছেন, পড়ছেন না। ঠিক গান নয়, কিন্তু গানের থেকেও মনোমুগ্ধকর ঝঙ্কারে বাবা বলে চলেছেন—

'আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে
ওই যে শবদ চিনি, নূপুর রিণিকিঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে।'

ওটা শেষ হতে আবার সুরু করেন—

'চারিদিকে তমস্বিনী রজনী দিয়েছে টানি
মায়ামন্ত্র-ঘের;
দুয়ার রেখেছি রুধি, চেয়ে দেখো কিছু হেথা
নাহি বাহিরের।
এ যে দুজনের দেশ, নিখিলের সবশেষ,

মিলনের রসাবেশ-অনন্তভবন;
শুধু এই এক ঘরে দুখানি হৃদয় ধরে,
দুজনে সৃজন করে নূতন ভুবন।
একটি প্রদীপ শুধু এ আঁধারে যতটুকু
আলো করে রাখে
সেই আমাদের বিশ্ব, তাহার বাহিরে আর
চিনি না কাহাকে॥'

কনখলের মন ঠিক ঠিক মানে না বুঝলেও থামথাই উদাস হয়ে যায়। বাইরের অবিশ্রান্ত জল পড়ার সাথে ঘরের ভেতরের অনুরণন মিশে তার মনের মধ্যে আর একটা জগৎ ধীরে ধীরে রূপ নেয়। মধি লিখিত সুসমাচার মুখের সামনে খুলে সে চোখের জল লুকোয়।

এমনি করে কনখলের বুকে সুর লাগে। সুন্দর কথার, সুন্দরতর ব্যঞ্জনার ছবি আঁকা হয়ে যায় স্বপ্নাবিল আচ্ছন্ন দৃষ্টি ঘিরে।

এই মোহময় পরিবেশ হঠাৎ ভেঙে খান খান হয়ে যায় বাইরে অনেক লোকের সম্মিলিত কোলাহলে। আর কাঁচের সার্শীতে ঘন ঘন করাঘাতে। বাবা, মা, কনখল, সবাই চমকে ওঠেন।

বড়ো দরজার সমস্তটা কাঁচজুড়ে একটি মানুষ, কোনো রকমে দুহাত দিয়ে দরজা ধরে নিজেকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচাচ্ছে। মাথায় বাবরী চুল কাদায় জটা হয়ে গিয়েছে, মুখভরা দাড়িভরা কাদা, বিরাট বুক, সবল মাংসপেশী, হাতীর শুঁড়ের মতো দুটো হাত, আর কিছু দেখা যায় না। নাক মুখ যেখানে কাঁচের সঙ্গে ঘেঁষে চেপ্টে গেছে, সে জায়গা-গুলো হলদে দেখাচ্ছে। যেন একটা রূপকথার দৈত্য এসে আছড়ে পড়েছে মৃত্যুবাণ খেয়ে, মনে হোলো কনখলের। সন্ধ্যার আগে ওর নজর পড়ল দৈত্যের চোখ দুটোর ওপর। কী অসহায়, কী করুণ, কী হতাশ চাউনী! বলিষ্ঠ দেহের অপ্রত্যঙ্গ ঘিরে সে কী আর্ত!

মা উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুহাতে মার কোমর জড়িয়ে ধরে কনখল বিস্ফারিত চোখে দৈত্যকে দেখতে লাগল। এই কি, এই কি—স্যামসন?

দৈত্যের সঙ্গে, পেছনে বহুলোক। বাবা গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দৈত্য ধড়াস্ করে পাপোষের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

কনখল জানলো, দৈত্যের নাম গফুর। মেকুলা গ্রামের চাষী। পরীর মতো বিবি পরীবানু। পরীবানুকে সাথে নিয়ে ঘরে যিনি এসে ঢুকলেন, তিনি হাজী ওবেদুল্লা। শাহ্জলালের দর্গার ইমাম। বাবা ইমাম সাহেবের হাত ধরে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। পরীবানু পাশে মাটিতে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বাইরে পাঁচসাত জন লোক একজন ভদ্রবেশী জোয়ানকে ঘিরে দাঁড়িয়ে, ইমাম সাহেব ইসারায় তাদের বারান্দায় দাঁড়াতে বললেন।

জানা গেল, ঐ জোয়ানের নাম কাশেম। মেকুলা গ্রামের বর্ধিষ্ণু জোতদার। গফুর তারই প্রজা। বিয়ের পর থেকে পরীর ওপর নজর পড়ে কাশেমের। পরী আমল দেয় না আদপেই। ফুস্লানো, দূতী পাঠানো, ব্যর্থ হয়ে যাবার পর, আজ মওকা মিলেছিল। বাড়ীর হাতায় দুটো ডালিমগাছ পুঁতবে বলে কাশেম গফুরকে ডেকে এনে গর্ত খোঁড়ার কাজে বহাল করেছিল। সন্ধে নাগাদ গর্ত মানুষ সই হয়ে যাবার পর, গফুর যেমন গর্ত থেকে

ওপরে উঠ্বে ঠিক করছে, অম্নি কাশেমের অনুচরেরা জনকয়েক দুখানা বাঁশ দিয়ে গফুরের দুকাঁধ চেপে দাবিয়ে ধরে রেখেছিল, আর অন্য কয়েকজনা মাটি ফেলে গর্ত ভরাট কর্তে সুরু করেছিল। গফুরের আর্তনাদ কাশেমের অনুচরদের হৈ হল্লায় চাপা পড়ে গিয়েছিল।

পরীকে এই ফাঁকেই কাশেম ধরে নিয়ে এসে বন্দিনী করেছিল, কিন্তু পরী কাঁচাবাঁশের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বিশেষ বেগ পায়নি। সে সোজা গিয়ে ইমাম সাহেবের পায়ে পড়ে সব খুলে বলেছিল। মেকুলা থেকে শাহ্জলালের দরগা সামান্যই দূর। ইমাম সাহেব লোকজন নিয়ে এসে গফুরকে একটু আগেই উদ্ধার করেছেন।

হৃষীকেশ এতক্ষণে বুঝলেন সফর থেকে ফেরবার পথে সন্ধ্যার সময় কিসের গোলমাল শুনেছিলেন।

কনখল জানে বাবা ইমাম সাহেবকে ভক্তি করেন। ইমাম সাহেবও বাবাকে, আর তাদের সবাইকে ভালোবাসেন। হৃষীকেশ নিভাননীর দিকে তাকিয়ে বললেন,

—কনাকে নিয়ে খাবার ঘরে গিয়ে বোসো। আর রহমথকে বলো, ডাক্তার জাফরকে ডেকে দিতে।

কিন্তু খাবার ঘর বসবার ঘরের মধ্যে শুধু কাপড়ের পরদা। কথা সব শোনা যায়। কনখলের কান রইলো খাড়া।

পাশের পুলিশ হাসপাতালের ডাক্তার জাফর সাহেব আসবার পর, ইমাম সাহেব যা বললেন, তার মোটামুটি মানে এই হোলো যে, পরী যদিও খুব ভালো মেয়ে, তবে আজকের ব্যাপারে সে একটু বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বইকি। কাশেম ডাকলে গফুর যেতে চায়নি, ও বেত ও বাঁশের কারিগর, ঘরে বসে তেপাই, চেয়ার বানায়, তার আয়ে স্বচ্ছন্দে সংসার চলে যায়। কিন্তু আজ কেবল পরীর তাড়ায় কাশেমের কাজে গিয়েছিল। কিন্তু সে যাই হোক, ওর ভুল ভাঙ্তেও দেরী হয়নি। ওই ত গিয়ে সময়মত ইমাম সাহেবকে খবর দিয়েছিল। তা না হলে গফুরকে কি আর জ্যান্ত ফিরে পাওয়া যেত। এখন হাকিম সাহেবের যা মর্জি।

বিশ্বাসঘাতকতা কাকে বলে, ঠিক অর্থ কনখল জানে না, তবে আভাসে বোঝে। কিন্তু ঐ পরীর মতো দেখতে পরীবানু, সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? ভুলিয়ে ভালিয়ে বিপদে ফেলার নাম যদি বিশ্বাসঘাতকতা হয়, তবে ত পরী তাই করেছে। ডেলিলা যেমন করেছিল স্যামসনকে। আর, আর,—ঐ জাফর ডাক্তারের মেয়ে আয়েষা, সেও ত কনখলের সাথে তাই করেছিল।

মার নিষেধ,—কংখ্, টকফল খাবে না, দুপুর বেলদুরে যাবে না, অসুখ করবে। সেদিন দুপুরে মা যখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, ত্রয়োদশী আয়েষা এসে ইসারায় ওকে বাইরে ডাক দিয়ে দিল ওর হাতে দুটি পাকা কামরাঙা। বাবুর্চিখানার পেছনে, যেখানে মুরগীর ঘর, সেইখানে বসে কনখল পরম আনন্দে কামরাঙায় কামড় দিচ্ছিল। এদিকে আয়েষা করেছে কি, শোবার ঘরে মাকে জাগিয়ে, বলেছে যে, কনা লুকিয়ে কামরাঙা খাচ্ছে, দেখবে চল মাসি।

ঘুমের চোখ মুছ্তে মুছ্তে মা এসে দেখেন, সত্যিই ত। আয়েষা ঘাগ্রা পরে, ওর ত আঁচল নেই, মার সাড়ির আঁচল মুখে চাপা দিয়ে হাসি আট্কাচ্ছে আয়েষা। কী চাপা দুষ্টু হাসি।

নিভাননীকে দেখে কনখল আধখাওয়া কামরাঙা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু মা সেদিন ওকে একটি চড় মেরেছিলেন। ওর লাগেনি। ও শুধু অপলক চোখে আয়েষার দিকে তাকিয়েছিল।

আয়েষা হঠাৎ কেঁদে ভেঙে পড়েছিল। বলেছিল, আমিই ওকে কামরাঙা এনে দিয়েছি মাসিমা, ওকে কিছু বলবেন না, আমাকে মারুন।

নিভাননী আর কারুকে কিছু বলেননি। দুজনার হাত ধরে ঘরে নিয়ে এসে প্রত্যেককে দুখানা করে হন্টলিপামারের নাইস্ বিস্কুট খেতে দিয়েছিলেন। বিস্কুট খেতে কনখলের খুবই ভালো লাগে, কিন্তু আজ সে বুঝল, যে পরাধীনদু গফুরের সাথে যা করেছে, সেদিন আয়েষা তার সাথে এর চেয়ে কিছু কম করেনি।

তবু কনখলের চোখে আয়েষা পরাধীনদুর চেয়েও সুন্দর। কনখল এটুকু বুঝল, যারা সুন্দর, যারা মন কেড়ে নেয়, তারাই বিশ্বাসঘাতকতা করে।

গফুরকে জাফর ডাক্তারের জিম্মা করে দিয়ে, পরাধীনদুকে ইমাম সাহেবের সাথে সে রাতের মতো দরগায় পাঠিয়ে দিয়ে, এবং দুচারজন অনুচর সমেত কাশেমকে থানা হাজতে পাঠিয়ে, বাবা অবসর হলেন।

রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। বুড়ো রহমৎ খানা কামরায় টুং করে টেবিল ঘণ্টি বাজিয়ে দিল।

সেই রাত্রে সমস্ত আকাশ ভেঙে পড়ল। শিলেট সহর, চেরাপুঞ্জী থেকে শ'খানেক মাইলের মধ্যে, পৃথিবীখ্যাত প্রতিবেশীর মান রাখল সে রাত্রে। ব্যাঙের ডাকে, আলেয়ার দপ্‌দপানীতে জিজগৎ উতরোল হয়ে উঠল। কনখলের শোবার ঘর আলাদা, সে রাত্রে নিভাননী কনখলকে বুকের কাছে নিয়ে শুলেন।

সমস্ত রাত ভয়তরাসে বুক নিয়ে মার কোল আঁকড়ে শুয়ে থাকা কনখলের নতুন নয়। এত বিষ্টি, খালি এইটেই নতুন। বছরখানেক আগে প্রথম শিলেট আসবার সময় যখন করিমগঞ্জ থেকে ষ্টীমার করে এসে বড়ো হাওড়ে নৌকোয় চড়া হয়, সে ছিল রাত্তির, অন্ধকার রাত্তির। জল, জল, জল—চারদিকে শুধু জল। পার নেই। সেই নিঃসীম নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে অসীম জলরাশির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কনখলের বুক ভরে উঠেছিলো একটা বিরাট ব্যাপ্তির আশীর্বাদে। যে দিগন্তে অতো বড়ো আকাশ আর অতো জল অদৃশ্য আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েছে, মন উধাও হয়ে গিয়েছিল তারই দিশারায়।

সে রাত্তির পুইয়ে সূর্য উঠেছিল। সমস্ত রাত্রির হতাশা একটু আলোর ছোঁয়ায় বুকভরা আশার আমেজ এনে দিয়েছিল। ওই বয়সেই কনখল বুঝতে সুরু করেছিল, কোনোটাই—ভয়, আশা, সুখ, দুঃখ,—স্থায়ী নয়। একটার পারে আর একটা জেগে থাকবেই।

আজকের বিষ্টির রাত যখন শেষ হল তখন ঝকমকে সকাল। বাবা মা গভীর ঘুমে। আজানের সুরের সাথে শাহজলালের দর্গার মিনার-এর ওপর তাজা নবারুণের আলো পড়ে এক নতুন জগতের সৃষ্টি করেছে। কবুতরের ঝাঁক মাঝখানের বড়ো মিনারটার ওপরে গোল হয়ে উড়ছে, কচি রোদ্দুরে তাদের ডানা, গলা, চিক্‌চিক্ করছে।

তমোনাশিনী উষার এই অভ্যুদয়কে পরমসত্য বলে জানলো কনখল।

২

পুলিশ হাসপাতালের টিলার নীচের মাঠে পোলো খেলা হয় প্রায় রোজ সকালেই। মাঠ ত নয় যেন ইরানী গালিচা। প্ল্যান্টাররা খরচের তোয়াক্কা করে না। কেবল খুব বিষ্টির রাত্তিরের পর ঘোড়ার খুর নরম মাটিতে বসে যায় বলে সাবধানে সওয়ার হতে হয়। ঘোড়াগুলোও এমন তৈরী যে তারাই যেন খেলোয়াড়, সওয়ারগুলো উপলক্ষ্য মাত্র। মাঠের যেখানেই বল থাক না কেন, সওয়ারকে এমন কায়দায় নিয়ে যাবে যাতে সে সহজেই ডান হাতে ধরা ডাণ্ডা দিয়ে বলটা ঠুকে দিতে পারে।

কনখল নিবিষ্টমনে খেলা দেখে। ওদের কাঞ্চন পোলো পনি নয়, শুধু চড়বার ঘোড়া। সহিস হারুণ যখন জিন কসে কাঞ্চনকে টিলার নীচের বড় রাস্তায় নিয়ে যায় বাবার জন্য, ও অনেকবার সওয়ার হয়েছে। তবে সব বারই হারুণ ঘোড়ার মুখের কাছের লাগাম ধরে নিয়ে গিয়েছে। ও অনেক কাকুতি মিনতি করেছে ছেড়ে দেবার জন্য, কিন্তু হারুণ ছাড়েনি। বলেছে, সাহেব বকবে। ও বলেছে,—কাঞ্চন ভীষণ ভালো ঘোড়া, কখনো আমাকে ফেলে দেবে না। তাছাড়া রোজ পোলো খেলা দেখতে দেখতে আমি শিখে গিয়েছি কি করে সওয়ার হতে হয়, হাঁটুর চাপ, রেকাবে পা, ষ্টেট গ্যালপের বিশেষ বিশেষ গতিভঙ্গীর সাথে কি করে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, সত্যিই দেখে দেখে শিখেছে কনখল। কিন্তু হারুণ নাছোড়-বান্দা, সাহেব বকবে, ওর ঐ এক ধুয়া।

সেদিন সকালে যখন হারুণ-সারথী কাঞ্চন সওয়ার হয়ে কনখল টিলার নীচে নামছে, তখন একে একে পোলো খেলোয়াড়রা মাঠে জমায়েৎ হচ্ছেন। জনা আষ্টেক প্ল্যান্টার, সিভিল সার্জন সাহেব, রাজপুত রাইফেল্‌স্ এর কর্নেল রণছোড় সিং, স্থানীয় জমাদার মজ্‌মাদার সাহেব সব পৌঁছে গেছেন। কনখল যখন বড় রাস্তায় গিয়ে পৌঁছল, তখন ডেপুটি কমিশনার হ্যাসেট সাহেব আস্‌ছেন।

হ্যাসেট কাঞ্চনকে ঘোড়সওয়ার দেখে খুব খুশী হয়েছেন বোঝা গেল। বললেন,

—হ্যালো ইয়ং ম্যান, তুমি ঘোড়ায় চড়তে পারো?

কনখল থতমত খেয়ে, ঘাড় কাৎ করে জানালো, পারে। গর্বে ফেঁপে উঠ্‌লো সে। এর আগে, অনেক সাহেব মেম তাকে ডার্লিং বয়, কিড, সুইটি বলেছে, ইয়ংম্যান বলে কেউ ডাকেনি।

—দেন কাম অন্। টেক্ এ হ্যাণ্ড। চলো পোলো খেলবে চলো।

হারুণকে ডেকে সাহেব বললেন,—বাবাকো ইধর বৈঠায় দো বলে নিজের কোলের কাছটা দেখিয়ে দিলেন।

হারুণ কনখলকে কাঞ্চন থেকে তুলে সাহেবের ঘোড়ায় বসিয়ে দিল। ওপরের বাংলোর বারান্দা থেকে হৃষিকেশ ও নিভাননী এ দৃশ্য দেখছিলেন, আর মুচকি মুচকি হাসছিলেন। কিন্তু হ্যাসেট যখন স-কনখল পোলো ময়দানে ঢুকে পড়লেন, তখন নিভাননী সভয়ে বললেন,

—ও কি, সায়েব কি ওকে নিয়ে খেলতে নামবে না কি?

—নাম্‌লেই বা। হ্যাসেটের কাছে যতক্ষণ আছে ভয়ের কিছু নেই। বললেন হৃষিকেশ। হ্যাসেট ওপরওয়ালা, তাঁর কাজের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চান না হৃষিকেশ। তাছাড়া, সাহেবের ওপর গভীর আস্থা হৃষিকেশের। সাহেব যা করবে, ভেবেচিন্তেই করবে, এ বিশ্বাস আছে তাঁর।

হ্যাসেট কিন্তু সত্যিই কনখলকে নিয়ে খেলায় নেমে গেল। পোলো যারা খেলেনি, কিম্বা মন দিয়ে দেখেনি, তাদের বোঝানো শক্ত, কি ভাবে খেলাটা চলতে থাকে। একদিকে চারজন সাহেব প্ল্যান্টার, অন্যদিকে হ্যাসেট, সিভিল সার্জন, মজ্‌মাদার আর রণছোড় সিং। তাক বুঝে গোলের সুযোগ পেয়ে হ্যাসেট লম্বা ডাণ্ডায় কনখলের হাত লাগিয়ে দিয়ে দিলেন গোল করে। যেসব সাহেবরা দর্শক ছিলেন, সবাই হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, ব্র্যাভো,

ইয়ং ম্যান।

খেলার শেষে কনখলের হাত ধরে হ্যাসেট হৃষিকেশের বাংলোয় এসে নিভাননীকে বললেন,—খুব ভয় পেয়েছিলে, না? এখন শিগ্‌গির চা ত খাওয়াও।

কনখলকে বললেন,—যাও তুমি এখন পড়াশোনা করো গে। বাগ্‌চি, নদশ বছর বয়স থেকে ছেলেদের ঝুঁকি নিতে শেখাবে। আঁচলে ঢেকে রাখলে কি ছেলে মানুষ হয়। তোমার ত খুব ঠাণ্ডা রাইডিং পনি আছে। ওকে রোজ কিছুক্ষণ একা চড়তে দিয়ো। সহিস কাছে কাছে থাকবে। তবে আমি আজ যন্দুর দেখেছি, ও মোটামুটি রাইডিং-এর কায়দা জানে। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আসতে দাও, সেজন্য দুচার বার আছাড় খেলেও কিছু যায় আসে না।

বাগ্‌চি বললেন,—আপনি যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই সুযোগ দেব। তবে কিনা ওর মা—

হ্যাসেট হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন,—তাহলে মার ভয় আগে ভাঙতে হবে। নিভাননীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—কাল থেকে খুব ভোরে তোমাকে ঘোড়ায় চড়া শেখাব। দেখনি, সিভিল সার্জনের মেম কেমন কায়দা করে বিকেলে ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া খেতে বেরোন।

খুব একটা হাসির ধুম পড়ে গেল। নিভাননী আরক্ত মুখে বললেন,—মাগো, তাই নাকি বাঙালী মেয়ে পারে! ডাক্তার সাহেবের বিবি ত খাস মেম সাহেব।

কনখল বাড়ীর ভেতরে যেতেই আয়েষা ওকে ধরেছে। ওর পোলো খেলা, গোল দেওয়া, বাহবা পাওয়া, কিছু আয়েষার চোখ এড়ায় নি। বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে আয়েষা বলে,

—সাহেব ত সাহেব, কনা সাহেব। কি করে তুই ওই গুপো ডাকাতটার ঘোড়ায় উঠলি রে কনা? যদি পড়ে যেতিস?

—আমি বুঝি ঘোড়ায় চড়তে জানি না? দেখিস নি হারুণের সাথে রোজ ঘোড়ায় চড়ি?

—সে ত হারুণ ঘোড়ার মুখ ধরে থাকে। ছেড়ে দিলে তুই পারিস চড়তে? ঘোড়া যদি ছোটে?

—আরে আমি ছোটালে তবে ত ছুটবে! অ্যায়সা কসে লাগাম টেনে রাখব, ঘোড়া ঠিক্ আমার ইচ্ছেমত চলবে।

আয়েষা ওর মাথায় একটা চাঁটি মেরে বাড়ীর পথ ধরে। বলে,—আচ্ছা, আচ্ছা, খুব বাহাদুর।

যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকায় আয়েষা। দেখে কনখল একদৃষ্টে তারই দিকে চেয়ে আছে। চোখোচোখি হতে কনখল মুখ ফিরিয়ে নেয়। দেখতে পায় না আয়েষার মুখ কী দুষ্টু হাসিতে ভরে গেছে।

সেদিনকার সেই কামরাঙা খাওয়ার ব্যাপারে কনখলের মন আয়েষার ওপর প্রথমে বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু মা ওকে মারতে যখন আয়েষা সব দোষ নিজের ঘাড়ে তুলে নিল, তখন কনখলের মন ভিজে গিয়েছিল। আয়েষা ত আর সত্যিই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, তা হলে অমন করে বলতে পারত না। আয়েষা ওর চেয়ে বড়ো, কিন্তু আয়েষা ওর মতো এতো বই পড়েনি। তবু কেমন গুছিয়ে কথা বলতে পারে। মনে মনে কনখল অনেক কথার ছবি এঁকে যেতে পারে, কিন্তু সে মুখচোরা। মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা তার নেই। বইয়ে পড়া অনেক বীরদের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে আত্মপ্রসাদ-এর স্বাদ পায় কনখল। সোহ্‌রাব রুস্তমের রুস্তম, সিকন্দর শাহ্‌-পুরুর পুরু, মহাভারতের অভিমন্যু, মণিপুরের টিকেন্দ্রজিৎ,—নিজের শোবার ঘরে একা একা এদের চরিত্র, বক্তব্য, কল্পনায় নিজের

ওপর আরোপ করে তৃপ্ত হয়। কিন্তু কেন যেন, আয়েষার চোখোচোখি হলে সব গুলিয়ে যায়।

নিভাননীর নিষেধের গণ্ডী সব ভেঙে যায় আয়েষার খঞ্জন চোখের একটু ভ্রূকুঞ্চনে। রোদ্দুরে যেয়ো না, টক ফল খেয়ো না, গাছে চোড়ো না, এসব 'না'কে ভণ্ডুল করে আলেয়ার আলোর মতো আয়েষা ওকে আকর্ষণ করেছে।

সেদিনই দুপুরে, মা বই পড়তে পড়তে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হতেই, পা টিপে টিপে আয়েষা এল। আজ আর বড়ো ঘাগরা নেই ওর পরনে, হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক, কাঁধে একটা সবুজ গামছা। এসে কনখলকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলল,

—কনা ভাই, চল মাছ ধরে আনিগে বড় ডাক্তার সাহেবের তলাও থেকে। ইয়া বড় বড় টাকী মাছে সিঁড়ির ফাটল ভরে গেছে। আর দাঁতকিনে কতো। সার সার ঘাটের কাছে ঘুর ঘুর করছে। গোসলখানা থেকে একটা গামছা নে, আর খানাকামরা থেকে ফিঙারবোলের একটা কাঁচের বাটি। চল, চল। মাসিমা জাগবার আগেই ফিরে আসব।

সাঁতার জানে না বলে পুকুর জলার ধার কাছ দিয়ে হাঁটা বারণ কনখলের। কিন্তু আয়েষার ডাক। সে অসহায়ভাবে ঘুমন্ত নিভাননীর দিকে তাকিয়ে বলে,

—মা যদি জানতে পারেন?

মা ওঠবার আগেই ফিরব রে গাধা। আর অনেক মাছ নিয়ে এলে মা ত বকবেনই না, হয়ত তারিফ করবেন, বলবেন, আমার কংস্ ছিলো তাই তাজা মাছ খেয়ে বাঁচলুম।

সাহেবী খানার বদলে মাছ ভাজা, মাছের ঝোল বেশী ভালোবাসেন মা, এ কনখল জানে। কাজেই মন স্থির করতে আর দেরী হয় না। বাটি, গামছা নিয়ে তৈরী হয় সে। পকেটে রজার্স-এর ছুরিটা নিতে ভোলে না। পা টিপে টিপে দুজনে রওনা হয় সিভিল সার্জন-এর টিলার পেছনের পুকুরের দিকে।

পুকুরটা মজুমাদার সাহেব জমিদারদের সম্পত্তি। যখন চালু ছিল, তখন হয়ত ভালোই ছিল, চিহ্ন পাওয়া যায় এককালের বাঁধানো ঘাটের ভগ্নাবশেষ। এখন ঘাটের সিঁড়ির ধাপিগুলো আধডাঙা, এধারে ওধারে বেতঝাড়ের জঙ্গল। বেতের আগাগুলো বর্ষার আশীর্বাদে লক্ লক্ করে বেড়ে উঠেছে, আঁশফলের মতো ছোট ছোট ফলের গুচ্ছে সে জঙ্গল ভরা। ঐ বেতের আগা দিয়ে ছোট্ট ফুলবড়ি দিয়ে মা মাঝে মাঝে বাবুর্চিখানায় গিয়ে সুক্তো রাঁধে আনেন, তিতকুটে বলে কনখল খেতে চায় না, কিন্তু হৃষিকেশ আগ্রহ করে খান। নিভাননীর নিষেধের প্রতিষেধক হিসেবে এক গোছা কচি বেতের আগা নিতে হবে মনস্থ করে কনখল।

বেতফলের প্রাচুর্য দেখে জিভে জল আসে দুজনারই। আয়েষা বলে,—কি পাকা পাকা ফলগুলোরে কনা—চল দু চার থোক নিয়ে আসি। তাপর মাছ ধরব।

—কিন্তু বেতঝাড় যে কাঁটায় ভরা। আর তা ছাড়া রহমৎ বলে বেতের ঝোপে সাপ থাকে।

আয়েষা ওর দিকে তাকিয়ে জিভ্ দিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করে। বলে,—ও, এই আমার বীরপুরুষ! সাহেবের কোলে আরামসে বসে ঘোড়সওয়ার হলেই সব বীরত্ব ফুরিয়ে গেল? দে, ছুরিটা আমায় দে—

বলে সময় দেয় না আয়েষা। ছুরিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে সে বনহরিণীর নৃত্যরঙ্গে ছুট দেয় বেতঝাড়ের দিকে। যখন দুচার থোকা ফল নিয়ে ফিরে আসে কনখল দেখে ওর মোটা ধবধবে পায়ের গোছা ছড়ে গেছে কাঁটার খোঁচায়। দু একে জায়গায় এক আধটু রক্তের চাঁড়ও দেখা যায়।

কনখল কালক্ষেপ করে না। তড়্‌তড়্‌ করে সিঁড়ি ভেঙে পুকুর থেকে গামছা ভিজিয়ে নিয়ে আসে। ঘাটপারে আয়েষা দাঁড়িয়ে। কনখল ধপ্‌ করে ওর পায়ের কাছে বসে পা দুটো বুকে জড়িয়ে ধরে ভিজে গামছা দিয়ে মুছে দেয়। মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করে,

—খুব লাগছে, না রে?

আয়েষার জবাবে চটুলতা নেই, কনখল ঠাওর করে না। ঢোক টিপে আয়েষা বলে,

—একটুও না!

কিন্তু পা ছাড়িয়েও নেয় না। এক হাতে কনখলের মাথার বড়ো বড়ো চুলগুলোর মধ্যে হাত বুলোয়।

মাথা তুললে কনখল দেখতে পেতো আয়েষার দু চোখে জল, ঠোঁটের কোণে গভীর পরিতৃপ্তির হাসি। সে হাসি বিজয়িনীর।

এই মোহমুগ্ধ ভাব আধ মিনিটও টিঁকতে দেয় না আয়েষা। হাতের তেলোর পেছন দিয়ে চোখ মুছে কনখলের দুহাত ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়। বলে,

—ভূত, দেরী হয়ে যাচ্ছে না? মাসিমার ঘুম ভেঙে গেলে কি কাণ্ড হবে মনে কর ত? এই রইল বেতফল, চল, বাটিটা নে, আর দেখ্‌, একটা শক্ত কাঠিগোছের কিছু নেত। যে কটা মাছ পারি চট্‌পট্‌ ধরে নিয়ে ফিরি চল।

গামছা, বাটি, শুক্‌নো ভাঙা গাছের ডালের কাঠি, এই সব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দুজনে পা টিপে টিপে জীর্ণ ফাটা পেছল সিঁড়ি ধরে জলের ধারে গিয়ে নাম্‌ল।

সবুজেকালো গভীর জল। বাণপোকাগুলো যেন জল ছুঁচ্ছে না, সাঁ সাঁ করে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। সার বেঁধে সত্যিই তিনচোখো দাঁড়কিনে মাছগুলো ঘাট পার দিয়েই আনাগোনা করছে। ওরা হাঁটুজলে নেমে গামছার দুধার দুজনে ধরে দাঁড়কিনে, খল্‌সে, বেলে, ছোটো চিংড়ি, তা মন্দ নয়, পোয়াটাক ধরল। তারপর টাকী ধরবার পালা।

আয়েষা বলল,

—কনা, তুই বাটিটা এই সিঁড়ির ফাটলের মুখে—আরে যে দিকটা জলের ভেতর—ওইখানে চাপা দিয়ে ধরে থাক্‌। টাকী মাছগুলো ঐ ফাটল দিয়ে ভেতরে ঢুকে যায় কিনা। আমি ওপর থেকে যেখানে যেখানে ফাঁক আছে, কাঠির খোঁচা দেব। যেই বলব, তাক করে বাটিটা ওপর মুখ করে তুলে নিবি। আচ্ছা, দাঁড়া, দাঁড়া। বাটিতে জল ভরে গেলে সুড়ৎ করে মাছ পালিয়ে যাবে। আমার গামছাটা সবুজ। এইটে দিয়ে বাটিটা ঘেরা টোপ করে নে। বাটি থেকে পালালেও গামছায় আটকাবে।

কথামত কনখল বাটি ধরল। আরে সত্যিই ত! খলখল করে একটা মাছ বাটিতে ঢুকে গেছে। তাক করে ঠিক তুলে ফেলেছে কনখল। আয়েষা বলছে, সাবাস কনা ভাই।

পাঁচসাতটা মাছ এইভাবে ধরবার পর, আয়েষা বলল,

—কনা ভাই, এইবার বাড়ী যাই চল। ধরা পড়লে মাও বকবে, মাসিমাও বকবে।

—সে কিরে—মার জন্য মাছ ধরছি, লুকোব কেন? মা যদি বলেন, কোথায় পেলি মাছ—তখন ত বলতেই হবে।

—দূর বোকা—সব সময় কি সব সত্যি কথা মাদের বলতে হয়। বলবি, আমরা পুকুর পাড়ে বসেছিলাম, রাখাল ছেলেদের দিয়ে ধরিয়েছি।

কনখল গম্ভীর হয়ে গেল। মোটা ধরা গলায় বলল,—সে আমি পারব না। জিজ্ঞেস না করলে কিছু বলব না, কিন্তু জিজ্ঞেস করলে মিছে কথা বলতে পারব না।

—জিজ্ঞেস না করলে কিছু বলব না—এই ত আয়েষার অর্ধেক জগৎ জয়। সে কনখলের হাত ধরে বলল,

—চল চল—আর দেরি করিস্‌ নে।

তারপর দুজনের পা টিপে টিপে গৃহপ্রবেশ, রহমতের হাতে বাবুর্চিখানায় মৎস্য সমর্পণ,—সত্যি সত্যিই এমন কপাল, যে গুরুজনদের কারো চোখেও পড়ল না। খুব বড়ো বড়ো হরপে ছাপা শিরীন ফরহাদ বলে একটা কেতাব আয়েষা ওকে পড়তে দিয়েছিল। সেইটে নিয়ে কনখল বারান্দায় বসে পড়তে সুরু করল।

একটু পরে নিভাননী এলেন। হৃষিকেশের অফিস থেকে ফেরবার সময় হয়েছে। কনখলকে পাঠরত দেখে মৃদু হেসে বললেন,

—আজ যে কংখু বড়ো লক্ষ্মী ছেলে। খুব পড়াশুনায় ব্যস্ত।

বলে, মোড়া টেনে কনখলের পাশে গিয়ে বসলেন।

কনখলের মুখ জুড়ে কী শুকনো, ক্লিষ্ট হাসি, নিভাননীর চোখে পড়ল না। কি যেন বলি বলি করেও কনখল বলতে পারল না। একজোড়া মোটা ধব্‌ধবে পায়ের গোছা তার বুক জুড়ে রয়েছে, সত্যি কথা বুক থেকে ঠেলে ঠোঁট পর্যন্ত আসতে দিচ্ছে না।

রাত্তিরে খাবার সময় হৃষিকেশ বললেন,

—ফার্স্টক্লাস তাজা মাছ ত! এমন মাছের ভর্তা অনেকদিন খাইনি।

নিভাননী বললেন,

—ওসব রহমতের কাণ্ড। কোত্থেকে খল্‌সে বেলে দাঁড়কিনে টাকী, সবই পুকুরের তাজা মাছ, জোগাড় করে এনেছে। আর রেঁধেছেও অপূর্ব।

যে দু এক গ্রাস কনখলের পেটে গিয়েছিল, ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল কান্নার ধমকে। সে চেয়ার থেকে নেমে কান্না চাপতে চাপতে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল।

হৃষিকেশ বললেন,—কনার হোলো কি?

—দেখে আসি, বলে নিভাননী উঠে গেলেন।

কনখল তখন বালিশ বুকে দিয়ে উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। নিভাননী ওর মাথা কোলে নিয়ে বসলেন। বললেন,

—কি হয়েছে কংখু? শরীর খারাপ লাগছে?

কনখল প্রথমে জবাব দিল না। তারপর মার বুকে মুখ লুকিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে মাছধরার ইতিহাস সব খুলে বলল।

নিভাননী আদর করে ওর চোখ মুছিয়ে বললেন,

—এসে আমায় সব বললেই ত পারতিস্‌। আমার কংখু মিছে কথা বলবে না, সে ত আমি জানি। কিন্তু যদি পা পিছলে জলে পড়ে যেতিস্‌?

আয়েষা ছিল যে। ও ত হাঁসের মতো সাঁতার কাটতে পারে। তাছাড়া আমরা সিঁড়ি থেকে জলে মোটে নামিইনি। ধার থেকেই যা পারি তাই ধরেছি।

—আচ্ছা বেশ করেছ। এখন খাবে চলো।

বলে নিভাননী কনখলের হাত ধরে খানা কামরায় ফিরে এলেন। হৃষিকেশ বললেন,

—হয়েছিল কি কনার?

—কি আবার হবে! শরীর হঠাৎ একটু খারাপ লাগছিল, তাই। আচ্ছা রহমৎ, মাছের

তরকারী সবটাই কি আমাদের জন্যে রেখেচ? আয়েষাদিদিদের বাসায় দাও নি?

—না মেমসাব্,—রহমৎ বলে।

—যাও, এখুনি অর্ধেকটা ও বাড়ী দিয়ে এস। ওঁদের খানা শেষ হয় নি ত?

—ডাক্তার সাহেবের বাসায় রাত সাড়ে নটার আগে কেউ খেতেই বসে না, মেমসাব।

—তবে ঠিক আছে। যাও দিয়ে এস।

হৃষিকেশ বলেন,

—ব্যাপার কি? এমন কিছু রাজকীয় খাদ্য নয়, যে এবাড়ী ওবাড়ী পাঠাচ্চ—

নিভাননী মৃদু হেসে বললেন,

—সবই তোমার জানা চাই। তবে শোনো। এ মাছগুলো আয়েষার ধরা। দুপুরে গামছা দিয়ে সিভিল সার্জনের পুকুর থেকে ধরেছে। কনাকে ভালোবাসে বলে সব দিয়ে গিয়েছিল বাবুর্চিখানায়। আগে জানলে আয়েষাকে রাত্তিরে খেতেই ডাকতাম।

কনখল বড়ো বড়ো চোখ তুলে ঠায় মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্বর্গের দেবীর মতো মার মুখ, মনে হয় ওর। কী সুন্দর ভাবে, কতো সহজে, সমস্ত ব্যাপারটার সমাধান করে দিলেন। আর এই মায়ের কাছে ও সত্যি লুকোতে গিয়েছিল।

আবার ওর চোখ ঝাপ্সা হয়ে আসে স্বস্তিতে, আর কতকটা আত্মধিক্কারে। মনে মনে পণ করে, মা যা যা বারণ করেছিল, আর সেগুলো সে কখনো করবে না।

প্রতিজ্ঞা করে সে রাত্রের মতো আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ফিরে আসে ওর। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোর রাতে কি স্বপ্ন দেখে ওই জানে। ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে বলে,—না না, কক্খনো না—আমি যাব না—তুই যা—

নিভাননী এসে আস্তে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেন ওকে।

৩

প্ল্যান্টার-রা নেমন্তন্ন করেছে শিকারের। মারাত্মক মৃগয়া নয়, পক্ষী শিকার। সময়টা শিকারের অনুকূল নয়, তবে খবর পাওয়া গেছে সুনামগঞ্জের রাস্তায় যে বড়ো হাওড় পড়ে, তাতে অনেক নারিয়েলি পড়েছে। হৃষিকেশ যাবেন, আয়েষার বাবা জাফর সাহেবও যাবেন। ছোকরা হারুণ সাথে যাবে। শেষ রাতে হ্যাসেট সাহেব টম্টম্ নিয়ে আসবেন। বাংলোয় তোড়জোড় চলছে। বারো বোরের বন্দুকটা সাফস্ফ করে রাখা হয়েছে। জলের মধ্যে শিকার, পোষাক পরিচ্ছদের বালাই নেই। ডেক্ সু, হাফ্ প্যাণ্ট, হাতকাটা কামিজ, ব্যস্, হৃষিকেশের আর কিছু লাগবে না। তবে চন্চনে রোদ উঠে যাবে ফিরতে, পিগ্স্টিকার হ্যাটটা নিতে হবে। দু থেকে ছ নম্বরের গুটি চল্লিশেক কার্তুজ হারুণের কাঁধের চামড়ার ঝোলায় থাকবে।

খাবার ঘণ্টির আগে হলকামরায় বসে এইসব বিলিব্যবস্থা হচ্ছে। জাফর সাহেবের সাথে আয়েষাও হাজির।

বড়রা যখন কথাবার্তায় ব্যস্ত, আয়েষা আর কনখল দাঁড় থেকে হাল্কা ষোলো বোরের বন্দুকটা নিয়ে অলীক লক্ষ্যে তাক করতে ব্যস্ত। আয়েষা বন্দুকটা ডান কাঁধে লাগিয়ে নলের মুখ বারান্দার দিকে করে দু পা ফাঁক করে ঘাড় কাৎ করে নিপুণ নিশানার অভিনয় করছে।

বাগচি জাফরের কানে ফিস্ ফিস্ করে বলেন, veritable Diana

নিভাননী বলেন, সীতারামের শ্রী।

ওরাই বড়োদের আলোচনার বিষয়, কনখল না বুঝলেও আয়েষা বোঝে। লজ্জায় ওর টুকটুকে গাল রাঙা হয়ে ওঠে। আস্তে বন্দুক নিয়ে দাঁড়ে রেখে দেয়।

পরদিন শেষরাত্রে শিকার পার্টি রওনা হয়ে যাবার পর নিভাননী ঘুমকাতুরে চোখে আবার গিয়ে শুয়ে পড়েন। কনখল বারান্দায় দাঁড়িয়ে যতক্ষণ না টম্টম্ চাঁদমারির টিলার পেছনে অদৃশ্য না হয়ে যায়, তাকিয়ে থাকে। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মোড়া টেনে বসে পড়ে। তখন যদিও সূর্যোদয় হয়নি, ওর আর ফিরে বিছানায় যাবার ইচ্ছে হয় না। শাহ্জলালের দর্গার অতোগুলো মিনারের মাঝখানের বড়ো গম্বুজটা ক্রমঃপ্রকাশ্যমান প্রত্যূষের আকাশে বিরাট প্রহরীর মতো মাথা জাগায়।

খানিক পরে পেছন থেকে কে ওর দুচোখ চেপে ধরতেই স্পর্শে বোঝে আয়েষা। কি নরম হাতদুটো। আয়েষা ওর গালে গাল ঠেকিয়ে কানে কানে ফিস্ফিস্ করে বলে,

—কনা ভাই, শিকার করবি?

—ধেৎ, বাবারা ত কখন চলে গেছেন।

—আরে না না, ওঁদের দলে না। তোতে আমাতে শিকার করে আসি চল।

—ভারী মজার কথা বললেন। আমাদের বন্দুক কই, হাতিয়ার কই—খালি হাতে ত আর শিকার হয় না। আর কি শিকার করবি?

—শিকার দেখবি? আয়—

বলে কনখলের হাত ধরে আয়েষা এগোয়। বাবুর্চিখানার পশ্চিমে একটা শিমুল গাছ—সেই দিকে আঙুল দিয়ে আয়েষা দেখায়।

পায়রার মতো এক ঝাঁক পাখী গাছটায় বসেছে। গলার কাছটায় সবুজে হলুদে মেশা রংয়ের প্রলেপ, বাকী গায়ের রং জালালী কবুতরের মতো। ভারী মিষ্টি শীষ দিচ্ছে পাখীগুলো।

আয়েষা ওর কানে কানে বলে,

—হরিয়াল। খুব ভালো পাখীরে—সাহেবরা যে নারিয়েলি হাঁস মারতে গেছে তার চেয়ে অনেক ভালো।

শিকারের প্রস্তাবে কনখল উল্লসিত। একটু ভেবে মাথা চুলকে বলে,—কিন্তু কি দিয়ে মারব?

আয়েষা আর একবার ওর হাত ধরে হলকামরায় নিয়ে আসে। বন্দুকের দাঁড়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়। ষোলোবোরের বন্দুকটা দাঁড় করানো আছে, কিন্তু টিপের মধ্যে শেকল দিয়ে তালা দিতে ভুলেছেন নিভাননী। আয়েষা বলে,—মাসিমার ঘর থেকে এই দ্যাখ্ চারটে টোটা এনেছি। চল।

বন্দুকে হাত দেয়া না দেয়ার সম্বন্ধে বিশেষ করে কোনো নিষেধ করেন নি নিভাননী। সাধারণ বিধি নিষেধের বাইরে বলেই করেন নি। কিন্তু কনখলের মন বলে, এতেও নিভাননীর নিষেধ আছেই। সে আয়েষার দিকে তাকায়, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলে না।

আয়েষার আয়ত চোখের মণি যেন গভীর পুকুরের জল। কোথায় তার তল, হদিস পায় না কনখল। আয়েষার ভাব যেন নিশির ডাক। কী প্রলোভন, কী সম্মোহন—অমান্য করে সাধ্য কি কনখলের। চমকে গা ঝাড়া দিয়ে বলে,—চল।

নবোদিত সূর্যকিরণ তখন বড়ো বড়ো গম্বুজের চূড়ায়, বড়ো বড়ো গাছের মাথায় সোনা ঢালতে সুরু করেছে।

সুপঠিত বাইবেলের আদম ইভের গল্প মনেও আসে না কনখলের।

দুজনে পা টিপে টিপে নিঃশব্দে শিমুলে তলায় যায়। বন্দুক আয়েষার হাতে। গাছতলায় কনখলকে হাঁটু ভেঙে বসিয়ে দেয় আয়েষা। ঘাড় তুলে গাছের দিকে তাকাতে ইঙ্গিত করে। হরিয়ালগুলো ভিড় করে বসে আছে, দু একটা পাখী ডানা ঝাপটে এ ডাল থেকে ও ডালে যাচ্ছে, বাকীগুলো স্থির হয়ে বসে শীষ দিচ্ছে।

আয়েষাও হাঁটু পেতে কনখলের পিছনে বসে ওর ডান বগলে টোটাভরা বন্দুক তুলে দেয়। ডান নলের ঘোড়া নামিয়ে বাংলে দেয় বন্দুক আকাশমুখী করতে। বলে দেয় যে নলের গোড়ার দিকের খাঁচ কাটার সাথে নলের মুখের মাছি আর পাখীগুলোর অন্তত চার পাঁচটা যখন এক লাইনে হবে, তখন ঘোড়া টিপতে। কিন্তু হাত যেন না কাঁপে। ওকি, বন্দুকের কুঁদো বগলদাবা কেন? না না, ওটা কাঁধের সাথে ঠেকু দিয়ে নিতে হবে। বাঁ চোখ বুজতে হবে, ডান চোখ খোলা থাকবে।

তালিম মাফিক কনখল আয়েষা যা বলে তাই করে। আয়েষা জিজ্ঞেস করে,

—ঠিক্?

—হুঁ।

—টেপ, ঘোড়া টেপ এইবার।

গুড়ুম। শান্ত উষার নিঃস্তব্ধতা ভেঙে সে আওয়াজ টিলায় টিলায় আছড়ে বেড়ায়—গুড়ুম—গুম্—উম্—

বন্দুকের পিছলাথিতে কনখল পেছনে উল্টে পড়তেই আয়েষা দুহাতে ওকে জড়িয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। বন্দুকের নল দিয়ে তখনো ধোঁয়া বেরচ্ছে। বন্দুকটা ওর কাছ থেকে নিয়ে, ওর কাঁধে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে,

—বড্ড লেগেছে, না রে?

এক ফায়ারে চারটে পাখী পড়েছে। তিনটে মরে গেছে, একটার বোধ হয় ডানায় লেগেছে, গাছতলায় থুপ্‌থুপ্ করে লাফাচ্ছে, আর ক্ষুদে ক্ষুদে লাল চোখ দুটো পিট্‌পিট্ করছে।

পাখীর দিকে তাকিয়ে কনখল বলে,

—কিচ্ছু লাগে নি।

বাবুর্চিখানা থেকে রহমৎ দৌড়ে আসে। শিকার দেখে হাত তালি দেয়। ছুরি এনে মরা তাজা চারটে পাখীই হালাল করে নেয়। বলে,

—সাবাস্ কন্যাবাবা, সাবাস্।

নিভাননী, আয়েষার মা, তাঁরাও আওয়াজ শুনে সরেজমিনে আসেন। বুড়ো রহমৎ দাড়ি ঝাড়া দিয়ে, ফোকলা দাঁতে একগাল হেসে বলে,

—হুজ্‌রাইন—কন্যাবাবার হাতের তারিফ্। এক ফায়ারে চারটে! ভারী খেলোয়াড় হবে বড় হলে।

কনখলকে নিয়ে নিভাননী আয়েষার টানাপোড়েনের আভাস আয়েষার অবচেতনে পৌঁছে গেছে। আয়েষা নিভাননীর মুখের দিকে তাকায়, তারপর রহমতের দিকে ফিরে বলে,

—চাচা, বুড়ো হয়ে কি ভীমরতি হচ্ছে তোমার? মারলাম আমি তারিফ হোলো

কন্যাবাবার?

আয়েষার দৃপ্ত ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে রহমৎ মাথা চুলকোয়। বলে,

—আয়েষা মাই এত বড়ো শিকার খেল্‌নেওয়ালী, কি করে জানব হুজ্‌রাইন। তাজ্জব, বড়া তাজ্জব—

নিভাননীর মুখ প্রসন্ন হয়। কাল রাত্রে ওই বন্দুক নিয়ে তাকু করার কথা মনে পড়ে। 'সীতারামের স্ত্রী',

জাফর সাহেবের স্ত্রী কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন,

—সর্বনাশী—কবে যে তুই নিজে মরবি, আর কাকে মারবি, ভেবে পাই না আমি। আসুক সাহেব ফিরে, তোর ব্যবস্থা করছি।

নিভাননী আয়েষার মাকে আড়ালে নিয়ে যান। বলতে বলতে যান, যেন কিছু না বলা হয় কর্তাদের। শাসন যা করবার তাঁরা নিজেরাই ত করতে পারেন। রহমৎকে বলেন, দুটো পাখী ডাক্তার সাহেবের বাবুর্চিখানায় দিয়ে আসতে। এক হাতে কনখলের, অন্য হাতে আয়েষার হাত ধরে নিয়ে যান নিজের বাংলোয়। কনখল থর্‌থর্ করে কাঁপছে। নিভাননী ভাবেন, দুটিতে মিলে লুকিয়ে এসে বন্দুক ছোঁড়ার উত্তেজনা।

দাঁড়ে বন্দুক রাখবার আগে রহমৎকে ডেকে বলেন নল সাফ করে দিতে। এখুনি। তারপর আয়েষার দিকে ফিরে বলেন,

—টোটা পৌঁলি কোথায়?

—দেরাজ খোলা ছিল। তুলে নিয়েছি। বলে তিনটে তাজা কার্তুজ ফেরৎ দেয়।

নিভাননী ওদের খাবার ঘরে বসিয়ে, গোসলখানা থেকে ফিরে আসেন। বলেন,

—সকালে কিছু খেয়েছিলি?

দুজনেই ঘাড় নেড়ে বলে, না।

রহমৎ বন্দুক পরিষ্কার করে এনে দিলে নিভাননী শেকল দিয়ে দাঁড়ের সাথে তালা মেরে দেন। কার্তুজ তিনটে দেরাজে পুরে দেরাজ চাবি বন্ধ করেন। করে, ওদের দুজনের মাঝখানে খাবার টেবিলে এসে বসেন।

নিভাননীর বয়েস প্রায় ছাব্বিশ সাতাশ। ত্রয়োদশী আয়েষার দিকে তাকিয়ে কেন যেন হিংসে হয় তাঁর। কনখলের কামরাঙা খাওয়া, মাছ ধরার কথা মনে পড়ে। তারপর স্থির দৃষ্টিতে আয়েষার চোখে চোখ রেখে বলেন,—সত্যি কথা বল্ এইবার। কে ছুঁড়েচে বন্দুক?

আয়েষা কিছু বলবার আগেই কনখল এক লাফে উঠে এসে মার কোলে মুখ গোঁজে। ধরা গলায় বলে,—আমি।

আয়েষা বলে,—ও শুধু ঘোড়া টিপেছে। টোটা নিয়েছি আমি, বন্দুক নিয়েছি আমি, পাখীর খবর এনেছি আমি, নিশানা করেছি আমি—

নিভাননী বলেন,—থাম্ থাম্। সব দুষ্টুমী তোরা দুজনে মিলেই করিস্, জানি আমি। কিন্তু যেগুলো বড়রা বারণ করেন, সে কাজ করতে নেই, এ বোঝবার বয়েস তোদের দুজনেরই হয়েছে। হয় নি?

মাথা নীচু করে থাকে দুই অপরাধী। জবাব দেয় না।

নিভাননী বলে চলেন,—বাবা এলে এবার কথ্‌খে স্কুলে ভর্তি হতে হবে। তোকে ত স্কুলে দেবেন না তোর মা বাবা, পাদ্‌রীদের মিস্ রোজ মেরী ডক্টর নাগের মেয়েদের

পড়াতেন, তাঁকে ঠিক্ করতে বলব তোর বাবা ফিরে এলে। মন দিয়ে করবার মতো কাজের সন্ধান না পেলে জংলী হয়ে যাবি তোরা। কেমন, রাজী ত?

দুজনেই ঘাড় নাড়ে। রাজী।

নিভাননী উঠে এসে আয়েষাকে ধরে নিজের সামনে দাঁড় করান। তারপর বুকে টেনে নিয়ে মাথার চুলের ঘ্রাণ নেন। আয়েষাকে ছেড়ে কনখলের দুগালে দুটো টোকা দেন। বলেন,—খেয়ে নে এখন। খাবার পর বারান্দায় আসবি। আমি সেইখানে থাকব।

উনি চা খেয়ে উঠে যেতে ওরা দুজনে এ ওর দিকে চেয়ে হাসে। বড়ো ম্লান সে হাসি। কারুরই মুখে একটা কথা সরল না, নীরবে ডিম, রুটি, দুধ খেয়ে যেতে লাগল।

বারান্দায় বসে বসে বেলা বারোটা পেরিয়ে গেল, হৃষিকেশ ও জাফরের পাত্তা নেই। মা আয়েষা কনখলকে চান শেষ করে আসতে বললেন। আয়েষাকে বললেন দুপুরে এখানে খেতে। বললেন,

—সাহেবরা যখনি ফিরুন, আমি থাকব বসে। তোরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিবি।

খানাকামরার পর্দার আড়াল থেকে রহমৎ বলল,—জী মেম্‌সাব। সব তৈয়ার।

বেলা দেড়টা নাগাত হ্যাসেটের টম্‌টম্ চাঁদমারির টিলার মোড়ে দেখা দিল। আয়েষা কনখল দুড়দাড় করে নিজেদের টিলা থেকে নেমে বড় রাস্তায় দাঁড়াল। বাঁদিকের পাদানে হারুণ বসেছিল। তড়াক করে লাফিয়ে নেমে, বন্দুক দুটো, আর দড়ি গাঁথা কম পক্ষে ত্রিশ বত্রিশটা পাখী নামালো। হ্যাসেট নিজেই টম্‌টম্ চালাচ্ছিলেন, বাগ্‌চি জাফর নামতে, টম্‌টম্ ছেড়ে দিলেন। বলতে বলতে গেলেন, —বাই বাই। হ্যাল্লো, ইয়ংম্যান—হ্যাল্লো ডার্লিং—

শিকারের পরিমাণ দেখে আয়েষা কনখলের চক্ষুস্থির। ও বাবা, এত! তা আবার আট দশটা পাখী একেবারে জ্যান্ত। সব আবার এক পাখীও নয়। ছোট নারিয়েলি হাঁস ত আছেই, দুটো বেশ বড়ো মোটাসোটা পাখী। অনেকটা তিত্তিরের মতো দেখতে। জাফর সাহেব বলেন,—ওগুলো কোড়া। মুরগী জাতের পাখী, জলে ডুব দিয়ে থাকে। অনেকক্ষণ পর এক আধবার মাথা জাগান দেয়। মারা ভারী শক্ত।

দলবেঁধে সবাই টিলায় উঠতে, রহমৎ এসে জিম্মাদার হয়। বাগচি সাহেব বলে দেন, সমান করে দুবাড়ীতে পাখী ভাগ করে দিতে। বলে, বাংলোয় গিয়ে ওঠেন। জাফর, আয়েষার হাত ধরে নিজের হাতায় চলে যান।

খাবার টেবিলে বসে হৃষিকেশ হৃষ্টচিত্তে বলেন,—আরে একি, পিজন পাই!

বলে পাইয়ের পাত্রের ওপরকার ময়দার আস্তর ভেঙে এক চামচ মাংস প্লেটে তুলে নেন। রসুই কার রহমৎ, খেতে যে অপূর্ব হয়েছে, তা বলে দিতে হয় না। হৃষিকেশ পাত্রটি নিঃশেষ করে বলেন,—পায়রা পেলে কোথায়? বাজার থেকে আনালে বুঝি?

—পায়রা নয় গো, পায়রা নয়। তবে পিজন বটে, গ্রীন পিজন।

বলে আনুপূর্বিক সকাল বেলার কিরাতযুথের কীর্তিকলাপের বর্ণনা দেন নিভাননী। তারপরেই বলেন,—তুমি বকাবকি কোরো না। শাপে বর হয়েছে। ওরা দুটিতেই পড়াশুনায় মন দিতে রাজি। একটা ভালো দিন দেখে ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে দাও। আর জাফর ডাক্তারকে বলো, মিস্ রোজ মেরীর সন্ধান করতে। কি যে ওদের মৎলব, অমন মেয়েকে স্কুলে দেবে না, লেখাপড়া শেখাবে না। আমায় দিয়ে দেয় ত আমি মানুষ করি। লাখে একটাও মেলে না আয়েষার মতো মেয়ে।

হৃষিকেশ কামরাঙা খাওয়ার অধ্যায়টা জানতেন না। কিন্তু মাছ ধরা আর আজ সকালের শিকার কাহিনী মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। বাঁ হাতে ঘাড় কাৎ করে গোঁপের ডগায় হাত বুলোন। তারপর নিভাননীর দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসেন। আস্তে বলেন,—কনাকে একেবারেই হারাবে তাহলে।

৪

আপিস থেকে ফিরতে সাধারণত হৃষিকেশের চারটে সাড়ে চারটে হয়। সেদিন নিভাননী গোটা তিনেকের সময় উঠে এক পেয়ালা চা খেয়ে বারান্দায় ডেকচেয়ারে এসে বসেছিলেন। পায়ের কাছে একদিকে কনখল তেঁতুলের বীচি সাজিয়ে এক থেকে একশ' করছে, ভেঙেচুরে যোগ করছে, বিয়োগ করছে। এ খেলাটা ও শিখেছিল শিলেট আসবার আগে ঢাকায়, খেলাটা ওর খুব ভালো লাগে। সাতাশিটা বীচি থেকে তেরটা সরিয়ে নিলে যে চুয়াত্তরটা থাকে, ও না গুনেই বলে দিতে পারে। মার পায়ের আর এক পাশে উবু হয়ে বসে আয়েষা নিবিষ্ট মনে "নারায়ণী" বলে একটা বই পড়ছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের লেখা উপন্যাস। নিভাননীর প্রিয় বই। আয়েষা বাংলা ভালোই জানে, ইংরেজিতে কাঁচা।

ওধারটার একটা বেঁটে মোড়ায় বসে রহমৎ অনর্গল বকে যাচ্ছে। বুড়ো মানুষ, কথা কয় বেশী। তা ছাড়া ওর ষাট একষট্টি বছর বয়েস হোলো, কতো জায়গায় কাজ করেছে, কতো সাহেব মেমের পরিবারে অন্তরঙ্গ হতে পেরেছে—গল্পের ভান্ডার ওর অফুরন্ত।

ইংরেজদের সাথে যখন সিপাইদের লড়াই হয়, ওর তখন ছ'সাত বছর বয়স। তার খবর কিছু রাখে না ও। তাছাড়া, সে লড়াই হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম মুলুকে, শিলেট পর্যন্ত ধাক্কা পৌঁছয় নি। ও জানে মণিপুরের রাজা কুলচন্দ্রের ছেলে টিকেন্দ্রজিতের গল্প। সাবাস্ জওয়ান টিকেন্দ্রজিৎ। ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছিল ইংরেজকে। বেইমানের ফাঁদে পড়ে প্রাণ দিতে হল বেচারার।

এমনি অফুরন্ত বক্‌বকানি চলতে থাকে রহমতের। এই দীর্ঘ জীবনের ওর অভিজ্ঞতা কম নয়। হাতে জরুরী কাজ থাকে না, নিভাননীরও শুনতে বেশ লাগে।

একটু জিরেন দিয়ে রহমৎ আবার সুরু করে,—এক ছোকরা সাহেবের খানসামা ছিলাম মা। কত জায়গায় আগে পরে খিদ্‌মত করলাম, অমন তেজী সাহেব দেখিনি। বাঙালী সাহেব, কিন্তু খাস্ গোরার থেকেও তিরিক্ষি মেজাজ। বিলেত থেকে পাশ করে জয়েণ্ট হয়ে এলো, থাকত ঐ হ্যাসেটের টিলার পেছনে ছোট বাংলোতে। ঘোড়ায় চড়ার জবর শখ, সওয়ার হয়ে যখন তখন গাঁয়ে গাঁয়ে দেহাতে দেহাতে টহল দিয়ে বেড়াত। কাছারী যেত নামমাত্র, ঘণ্টাখানেকের জন্যে। তখনকার ডিপ্‌টি কমিশনার মারলো সাহেব কিছু বলতে গেলে মুখ বেঁকিয়ে পাইপটা ডান দিক থেকে বাঁদিকে নিত। সিবিলিয়ান সাহেব, কেউ কি ঘাঁটাতে সাহস পেত? কিন্তু কালা চামড়ার সাহেব, প্ল্যাণ্টার ফিরিঙ্গীগুলোর চক্রান্তে প্রায় একঘরে হয়ে থাকতে হোতো। দেশী বিদেশী কোনো দলেই নিজেকে মানিয়ে উঠতে পারতো না জয়েণ্ট সাহেব। বড় কমিশনার সালতামামী তদারকে যেদিন এলো, মুশকিল সুরু হোলো সেইদিন। ডগ্‌লাস কাছারীতে গিয়ে দেখল জয়েণ্ট সাহেবের এজলাস খালি, সাহেব নেই। মারলোকে ডগ্‌লাস জিজ্ঞেস করলো, তোমার জয়েণ্ট কোথায়?

মারলো লোকটা ধীর, স্থির। বললো, কাছেই একটা মার্ডার কেসের ডাইং ডিক্লেয়ারেসন নিতে পাঠিয়েছি। কমিশনার পাইপটা ঝুটে ঠুকে ঝেড়ে ফেলে, আবার তাজা তামাক ভরতে ভরতে বলল, ঠিক আছে। কাল ওর দফ্‌তর তদারক হবে। সদরে যেন থাকে। বলে মারলোর টম্‌টম্‌ হাঁকিয়ে প্ল্যান্টার ক্লাবে চলে গেল। গোটা চারেকের সময় জয়েন্ট সাহেব ফিরল। ঘোড়ার রেকাব থেকে মাটিতে পা দিতে না দিতে মারলো এসে বললো, কোথায় গিয়েছিলে? ডিভিসনাল কমিশনার—উপরওয়ালা—সদরে থাকতে কি কাছারী কামাই করতে হয়! বলে গেছে কাল তোমার কাজ তদারক করবে। ডগ্‌লাসকে গরমেজাজী মনে হোলো। পরে শুনেছি গরমেজাজের কারণ ছিলো। কালা আদমী সিভিলিয়ান হয়েছে, চাকর সাহেবরা বরদাস্ত করতে পারত না। অনেক নালিশ নাকি গিয়েছিল শিলংয়ে লাট ফুলারের দেওয়ান-ই-খাসে। একজন বাঙালী, সাহেবদের সাথে সমানে টেক্কা দিয়ে দাপটে চাকরী করছে, এতে মুখে কিছু না বললেও দেশী আমলারা জয়েন্ট সাহেবের ভক্ত ছিল। তারাই মাঝে মাঝে গোপন খবর দিত। জয়েন্ট শুনে মুখ বেঁকিয়ে হাসত। বলত কুস্তালোগোঁকো চিল্লানে দো। মারলোর কথা শুনে আমার সাহেব ডিপুটি কমিশনারের দিকে তীরের মতো চোখে তাকালো। বলল, আচ্ছা, ঠিক্‌ আছে। সে রাত্তিরে জয়েন্ট বাংলোয় ফিরল না। আরদালী এসে খবর দিতে আমি খানা নিয়ে এজ্‌লাসে গেলাম। যা কিছু সেখানেই বসে খেয়ে, সাহেব কাজে ডুবে গেল। ফিরল, সেই শেষ রাতে। পরে শুনেছি, দেড় মাসের রোজনাম্‌চা সাহেব এক রাত্তিরে বসে লিখেছে। পরদিন ঠিক্‌ সাড়ে দশটায় কাছারী গিয়েছে। ফিরে এলো দেড়টা দুটোয়। চেহারা দেখে আমি ভড়কে গেলাম, মেম সা'ব। দুচোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বেরোচ্ছে—দাঁতে দাঁত চাপা—নিঃশ্বাসের হল্‌কায় যেন গা পুড়ে যায়। এসেই বলল, পরিষ্কার বাংলায়—যে সাহেব ইংরেজি হিন্দী ছাড়া কোনো বাৎ করেনি,—রহমৎ, আমার বিছানা তোরঙ্গ গুছিয়ে দে। আমি আজই কলকাতা রওনা হব। ঘোড়া বেচ্‌বার ব্যবস্থা নাজিরবাবু করবেন। আস্‌বাব যা আছে, তোর যেটা খুশী রাখ্‌। বাকী নাজিরবাবুর জিম্মা করে দিবি। আমি নোক্‌রী ছেড়ে দিয়েছি। আমার বুক ভেঙে পড়লো মেমসা'ব। সাহেবকে আমি কেন জানিনা ভালোবেসে ফেলেছিলাম। পাছে আমি সান্ত্বনার কিছু বলি, ভেবে সাহেব জ্বলে উঠলো। বাজের আওয়াজের মতো গম্ভীর গলায় সাহেব খালি হাঁক্‌লো, রহমৎ! আমি মাথা তুলতে পারলাম না মেমসা'ব। সাহেব গট্‌গট্‌ করে বাংলোর ভেতরে চলে গেলো। খানিক বাদেই, দেখি দলে দলে কাছারীর আমলা-ফয়শালা থেকে সুরু করে টাউনের গণমান্য ভদ্রলোক সব আস্‌ছেন। সবায়েরই মুখে দুঃখের ছাপ, আমলাদের কারো কারো চোখে জল। সবায়েরই এক কথা—ঝোঁকের মাথায় যা করেছে, যেন ফিরিয়ে নেয়। যা করবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে করে।

মিনিট পাঁচেক পর চটিজুতো ফট্‌ফট্‌ করতে করতে সাহেব ফিরে এল। ইয়া তাজ্জব! পরনে ধুতি, গায়ে কামিজ। হাত জোড় করে সবাইকে বারান্দায় গোল কামরায়, বসালো। হুকুম হোলো, সবাইকে মিষ্টি খাওয়ানোর। সহিস ছোঁড়া টাকা নিয়ে ছুট্‌লো দোকানে।

সাহেব বল্‌লো, আপনারা আমাকে ভালোবাসেন আমি জানি। আমি আপনাদের একজন হয়ে আপনাদের সাথে মিশিনি, তা সত্ত্বেও। আমার বিদেশী তবকমোড়া চেহারা আপনাদিগে ফাঁকি দিতে পারেনি, জেনে আমার মন আজ ক্ষমা ভিক্ষা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। আমায় মাফ্‌ করুন, কোনো অনুরোধ করবেন না। আমি যা করেছি, হুজুগে

মেতে করিনি। অনেকদিন থেকেই বুকের মধ্যে ঝড় উঠেছিলো, ফিরিঙ্গি রাজত্বের আবহাওয়া বিষাক্ত লাগছিলো। চাকরী ছেড়ে আজ আমি চলে যাচ্ছি, আপনাদের ছেড়ে যাচ্ছি না। বরং উলটোটা সত্যি। আজ আপনাদের একজন হয়ে সবায়ের মধ্যে এসে দাঁড়াতে পারলাম, এই গর্বে আমার বুক ভরে উঠেছে।

আর কে কি বলবে? সবাই চুপ।

পাত্তা নিয়ে পরে জেনেছিলাম, যে ডগ্‌লাস্‌, দেড় মাসের ডায়েরী একরাত্রে লেখা, ধরে ফেলে বলেছিল, সব বাঙালী চোর হ্যায়। জয়েন্ট সাহেব ডায়েরীখানা ডগ্‌লাসের মুখে ছুঁড়ে মেরেছিল। বলেছিল, সে তোমাদের লালমুখোদের কৃপায়। চোরের রাজা তোমরা, চুরী করে রাজত্ব নিয়েছো, সবাইকে চোর তোমরাই বানাচ্ছো। রইল আমার চাক্‌রী—এখুনি ইস্তফা দিলাম আমি। শিলং-এ কলকাতায় তার করে দিচ্ছি। বলে হতভম্ব ডগ্‌লাসকে এজলাসে ফেলে সোজা বড় ডাকঘর হয়ে ফিরে এসেছে বাংলোয়।

নিভাননী, কনখল, আয়েষা মন্ত্রমুগ্ধের মতো গল্প শুনেছিলেন। এইবারে নিভাননী জিজ্ঞেস করলেন,—সাহেবের নামটা কি রহমৎ?

—সুরিন্দর বানার্জি।

কনখল উচ্চকিত হয়ে ওঠে। ও নাম তার জানা। শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে ও নাম জপমন্ত্র, তা কেউ প্রকাশ করুক আর না করুক। ভাবুক ছেলে কনখল, ভাবতে বসে।

ওর মনের পটে ছবি ফোটে ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিলের। বছরখানেক কি বছর দেড়েক আগে। নবাবপুরের রাস্তা ধরে চৌকী চলেছে, সারের পর সার। একটা চৌকীর কথা ওর স্পষ্ট মনে আছে।

সে চৌকীতে বিরাট একটি মেয়ের মূর্তি—মাথা যেন আকাশ ছুঁয়েচে। বাঁ কাঁধ থেকে ডান কোমর পর্যন্ত কে বা কারা তলোয়ার চালিয়ে দু ফাঁক করে দিয়েছে। ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। কনখলের চোখে ভাসে, মূর্তির বুকের ওপর বড় বড় বর্ফের লেখা "বঙ্গমাতা"।

দেবীর পায়ের কাছে অনেক লোক, তার মধ্যে জনতিনেকের নাম কনখল ভোলেনি। আবদুল রসুল, সুরেন ব্যানার্জি, বিপিন পাল। এমন কায়দায় এসব মূর্তি গড়া, দেখে রক্তমাংসের মানুষ বলে ভুল হয়। থেকে থেকে ধ্বনি উঠছিল "বন্দে মাতরম্‌"। হাজার হাজার লোক, হিন্দু মুসলমান একত্র, চৌকীর সাথে সাথে রাস্তা ধরে গান গাইতে গাইতে চলছিল—

আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা মানুষ আমরা নহি ত মেষ,
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।

বীরদর্পে চলেছে সবাই, কিন্তু অন্ধোরে চোখের জল পড়ছে। দেখে কনখলের চোখেও জল এসেছিল। মহরম পরবের তাজিয়ার সাথে যারা 'হায় হাসান, হায় হোসেন' ধ্বনি তুলে যায়, তাদেরও এমনি চোখে জল, এমনি দৃপ্ত পদভঙ্গী দেখেছে ও। কিন্তু মিছিলের "বঙ্গমাতা" দেখে খালি মিছিলের লোকেদেরই নয়, সমবেত অগণিত দর্শকমণ্ডলীর কারো চোখই শুক্‌নো থাকেনি।

আসল ব্যাপারটা কি, বোঝবার বয়স কনখলের নয়, কিন্তু সেদিন সে মাকে রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিল,

—এ সব কি, মা?

মা বলেছিলেন,—বঙ্গভঙ্গ হয়েছে কিনা, তারই বিরুদ্ধে আন্দোলন।

এসব শক্ত কথা কনখল বোঝেনি। বলেছিল,—বঙ্গভঙ্গ কি মা?

—আমাদের এই বাংলাদেশ এক ছিল। বাংলা বলতে কোন দেশ বোঝায়, বল ত?

কনখল মাথা নেড়ে বলে,—তা ত ঠিক্ জানি না।

—যে দেশে আমরা জন্মেছি, সেই দেশ। যে দেশের সবাই বাংলায় কথা বলে, সেই দেশ। তা সে হোক্ হিন্দু, হোক্ মুসলমান। এখন হয়েছে কি, নির্ঝঞ্ঝাটে রাজত্ব করবার সুবিধের জন্য ইংরেজরা বছর কয়েক আগে বাংলা দেশের পূর্ব দিকটা কেটে আসামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। আর পশ্চিম দিকটা বেহার আর উড়িষ্যার সাথে। তুমি যেমন আমার কোলে জন্মেছ বলে আমি তোমার মা, তেমনি আমরা সবাই বাংলা দেশের কোলে জন্মেছি বলে বাংলাদেশ সব বাঙালীরই মা। ঐ যে দেবীমূর্তি চৌকীর ওপর দেখছ, দেখ ওর বুকে লেখা "বঙ্গমাতা", আর পায়ের কাছে হিন্দু মুসলমান যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা ঐ মায়ের কয়েকজন বীর ছেলে। বাংলামায়ের গায়ে তরোয়ালের ঘা দেখিয়ে এইটে বোঝানো হয়েছে যে বাংলা কেটে দুভাগ করা হয়েছে। আর ঐ বীর ছেলেরা পণ করেছেন, এ ভাগ থাকতে দেবেন না। বাংলাকে আগের মতো এক করে দিতে হবে।

কনখল বুঝুক আর নাই বুঝুক, গভীর মনোযোগের সঙ্গে মার কথাগুলো শুনেছে। একেবারে বোঝেনি কিছু, তা নয়। বলেছে,—আমিও ত ওদের সঙ্গে যেতে পারি?

—নিশ্চয় পারো, তবে তুমি এখনো যে বড্ড ছোটো।

সেই দিন নিজের অল্প বয়সের জন্য কনখলের মনে ধিক্কারের ভাব এসেছিল। বছর আষ্টেকের ছেলের পক্ষে যতটুকু সম্ভব।

আত্মগ্লানির আরও কারণ ছিল। এ বোধ ওর মনে উঁকি দিয়েছিল, যদিও ভাষায় তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা ওর হয়নি, যে তার বাবা ওই ইংরেজেরই চাকুরে। মাকে বলি বলি করেও বলা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সেদিন বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিল কনখল। ওর অপরিণত চেতনে সেদিন পরস্পর বিরোধী দুটি ভাবের ঝড় উঠেছিল। বাবা যা করেন, তা কখনো খারাপ হতে পারে না, সাহেবিয়ানাও নয়, ইংরেজদের মতো পোষাক পরাও নয়। আর এত লোক যে ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সদর্পে দাঁড়িয়েছে, দেশের দুঃখে চোখের জল ফেলছে, এও'ত তুচ্ছতাচ্ছিল্যের জিনিষ নয়।

সেদিন থেকে বেশ কয়েকদিন মন মরা হয়ে রইল কনখল।

কদিন পরে নিভাননীকে জিজ্ঞেস করে কনখল,—আচ্ছা মা, বাবা কি কাজ করেন?

—বিচারকের। যারা চুরী, ডাকাতি, অন্যায় কাজ করে তাদের বিচার করে শাস্তি দেন।

—সে ত খুব ভালো কাজ, না মা?

—হ্যাঁ বাবা।

—সে কাজ'ত ইংরেজদের কাছে চাকুরী না করেও করা যায়।

—তাকি যায়? ইংরেজরা যুদ্ধ করে এদেশ জিতে নিয়ে রাজা হয়েছে, বিচারের কাজ'ত রাজার অধীনে থেকেই করতে হয়।

—তাহলে রাজা যদি অন্যায় করেন, অধীনের লোক'ত তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবেন না।

নিভাননী এতক্ষণে বোঝেন ছেলে কেন কদিন থেকে এমন বিষণ্ণ হয়ে আছে। ভালো করে খায় না, ঘুমোয় না। বেশী কাছে আসতেও চায় না, দূরে দূরে থাকে। আদর করে কাছে টেনে নেন ছেলেকে। বলেন,—কংখ্, জানিস্ সেদিন মিছিলের গান দুটো কার লেখা? সেই 'বন্দে মাতরম্' আর 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা'?

কনখল ঘাড় নেড়ে জানায়, না।

—প্রথমটা বঙ্কিমবাবুর, যাঁর গ্রন্থাবলী বাড়ীতে আছে। আর একটা ডি, এল, রায়ের। ওঁরা দুজনেই তোর বাবা যে কাজ করেন, সেই একই কাজ করতেন। বলবার কায়দা জানলে মনের কথা সব বলা যায়!

কনখলের মনে আশ্বস্তির প্রলেপ পড়ে। ভাবে, বাবাও কায়দায় পেলে অমনি করে বলতে পারেন।

একটু একটু করে মনের গ্লানি কেটে আসে ওর। ঢিল খাওয়া পুকুরের জলের মতো ক্ষণিক ঢেউয়ের দোলা তুলে আবার নিস্তরঙ্গ হয়ে আসে ওর মন। আশ্রয় খোঁজে মা বাবার সুনির্ভর পরিচিত পরিবেশে।

কিন্তু যে সংশয়ের বীজ মনের গভীরে পোঁতা হয়ে যায় সেদিন, তার থেকে কবে ডাল-পালা সমেত বিরাট গাছ গজিয়ে উঠবে, সে বিচারের বয়স সেটা নয়।

তারপর কতদিন কেটে গেছে। উৎকট সাহেবিয়ানার হরেক রকম উপকরণ ও আড়ম্বর জীবনপথে নিত্যসঙ্গী হলেও ওর শিশুমনের বিস্তারের পথে বাধানিষেধের পাকা দেয়াল তুলতে পারেনি। ঘৃণা দ্বেষের বোধ যেন মুছে যাচ্ছে ভেতর থেকে যত বড় হচ্ছে। কে যেন অলক্ষ্য অন্তরাল থেকে ওর কানে ভালো লাগার, ভালোবাসার, মন্ত্র জপ করে যায়। সেই উদার মাঙ্গলিকের সুরে ওর মনে তৃপ্তি ও শান্তির অমৃত বর্ষণ হয়।

রহমৎ কখন উঠে বাবুর্চিখানায় চলে গেছে। আয়েষাও বাড়ী গেছে। নীচে বড় রাস্তায় সাইকেলের ঘণ্টি বাজতে হারুণ তর্‌তর্ করে টিলা থেকে নেমে গিয়ে সাইকেল ধরে। হৃষিকেশ নিত্যকার কাছারী যাওয়া আসা সাইকেলেই সারেন।

নিভাননী জেনে নেন চা কোথায় দেওয়া হবে। ঘরে, না বারান্দায়। বারান্দায়, বলে হৃষিকেশ কাপড় ছাড়তে যান। তেতুল বিচি, বই, পত্রিকা, তুলে রাখতে বলে নিভাননী কনখলকেও কাপড়চোপড় ছাড়তে বলেন। হারুণকে বলেন চায়ের মেজ বারান্দায় লাগাতে। নিজেও একটু গোছগাছ হয়ে আসতে যান।

চা-পর্ব শেষ হলে হৃষিকেশ বলেন,—সেদিন হ্যাসেট কনাকে ঘোড়ায় সওয়ার করে একা ছেড়ে দিতে বলেছেন। ওর জন্যে একটা ব্রিচেস্ বানাতে দিয়েছিলাম। দেখ ত, ইউসুফ এল নাকি।

ইউসুফ সরকারী চাপরাসী। কাছারির ডিড্ বক্স কাঁধে করে সে একটু আগেই এসে পৌঁছেচে। নিভাননী ভেতরে গিয়ে একটা কাগজের পুলিন্দা নিয়ে আসেন। তার থেকে বেরোয় পাচপো হাঁটু থেকে ফুলো ইজের, ছাই ছাই রংয়ের। তখনো খাকীর চল হয়নি, খাকী সুলভও নয়, অনায়াসপ্রাপ্যও নয়।

হৃষিকেশ হারুণকে ডেকে ঘোড়ায় জিন চড়াতে বলেন। কাঞ্চন এলে নিজে গিয়ে রেকাবের বক্‌লস টেনে খাটো করে দেন। বিচিত্র ইজের পরিহিত কনখল মায়ের হাত ধরে বাইরে আস্‌তে তাকে চ্যাংদোলা করে তুলে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দেন। দিয়ে বলেন হারুণকে লাগাম ধরে টিলা থেকে নামাতে। মাঠে পৌঁছে খোকাবাবার হাতে ঘোড়া ছেড়ে দিতে হবে, সেটাও বুঝিয়ে দেন। তবে সে যেন সাথে সাথে থাকে।

সব কাজই হুকুম মাফিক হয়, তবে মাঠে পৌঁছেই কনখল পা দিয়ে কাঞ্চনের পেটে গুঁতো লাগায়। জড়তা ভেঙে একটু হাত পা খেলানোর সুযোগ পেয়ে কাঞ্চন সানন্দ

হ্রেষাধ্বনি করে সবেগে ছুট দেয়।

বাংলোর বারান্দায় নিভাননী আতঙ্কে হৃষিকেশের হাত চেপে ধরেন, বলেন,

—ওগো কি হবে! পড়ে যাবে যে! হারুণকে ছুটে গিয়ে রাশ পাকড়াতে বলো—

কখন যে আয়েষা ফিরে এসেছে, কেউ দেখেনানি। আয়েষার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে বলে,—কিচ্ছু ভয় নেই মাসিমা,—ঐ দেখুন কনাকে, কেমন করে চালাচ্ছে। সাধ্য কি ঘোড়ার ওকে ফেলে দেয়!

সত্যিই আশ্চর্য দৃশ্য। পাকা ঘোড়সওয়ারের মতো কনখল জিন থেকে একটু উঠে রয়েছে, সমস্ত শরীরের ওজন দুই রেকাবে, হাঁটু দুটো চিমটের মতো আঁকড়ে আছে ঘোড়ার কাঁধ, নিজে হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়েছে ঘোড়ার গলা বরাবর, রাশ ঢিল দিয়ে মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে। সওয়ার কাঁচা বলে ঘোড়া বেয়াদপি করে ছুট্ লাগায়নি, কনখল ইচ্ছে মতো ঘোড়াকে ছোটাচ্ছে।

পুরো দু চক্কর পোলো ময়দান পরিক্রমা করে ঘোড়া এসে হতভম্ব হারুণের কাছে দাঁড়ায়। কনখল লাগাম কসে টেনে জিনের ওপর ধপ্ করে বসে পড়ে। বসে কাঞ্চনের ঘাড়ে গর্দানে হাত বুলোয়। কাঞ্চন ঘাড় বেঁকিয়ে কনখলের দিকে চেয়ে চিঁহি চিঁহি করে ওঠে। যেন বলতে চায়, কেয়াবাৎ, বহুত আচ্ছা।

নিভাননীর কানে কানে হৃষিকেশ আওড়ান—

ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবনস্রোত আকাশে ঢালি,
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি, চলেছি নিশিদিন—
* * *
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন।

বিপদ মাঝে ঝাঁপায়ে পড়ে শোণিত ওঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে জীবন জেগে উঠে।

নিভাননীর মন অনির্বচনীয় আনন্দে উতরোল। কিন্তু কপট ঝাঁজ দেখিয়ে বলেন, —যদি পড়ে যেত? বাঁচত তা হলে?

—আরে ছেলে কার দেখতে হবে ত! সেই যে কি বলে, বাপ্‌কা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া, কুছ্ নেহি ত থোড়া থোড়া।

কাঞ্চন-সওয়ারী কনখল টিলার সামনে এসে তড়াক্ করে এক লাফে নেমে পড়ে। আয়েষা ছুটে গিয়ে ওর হাত ধরে। বলে,—সাবাস।

বারান্দায় উঠে মা-বাবার পাশে এসে দাঁড়ায়।

বাবা বলেন,—গুড্ বিগিনিং। ভয়ের কিচ্ছু নেই। রোজ চড়বে। কাল হ্যাসেটকে ডাকব চায়ে। খুব খুশী হবেন।

মা ওকে পিঠ্ চাপ্‌ড়ে বলেন,—তোর একটুও ভয় করেনি? কি জোরে ছুট্‌লো কাঞ্চন, আমি ত এখান থেকে দেখেই ভয়ে মরি।

কনখল চালিয়াতি শেখেনি। বলে,—ভয় কিসের মা? আমি ত শক্ত হাতে রাশ ধরে ছিলাম। যখনি মনে হোতো রাশটেনে ঘোড়া থামিয়ে দিতে পারতাম।

আয়েষা কনখল হাত ধরাধরি করে গল্প করতে করতে বেড়িয়ে বেড়ায়। নিভাননী

হৃষিকেশ আলাপ আলোচনায় মগ্ন হয়ে যান। নিভাননী জানিয়ে দেন,—ওরে তোরা বেশী দূরে যাস্‌নি। নতুন রেকর্ড এসেছে কলকাতা থেকে, আলো জ্বাললে ফনোগ্রাফ বাজানো হবে।

ওরা ঘাড় নেড়ে জানায়, শুনেছে।

আয়েষা কনখলের কাণে চুপি চুপি বলে,—অত জোরে ছোটাতে আছে, গাধা? যদি পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙা 'দ' হয়ে যেতিস্? আমি মুখে বাহবা দিচ্ছিলাম, কিন্তু বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। কি ডাকাতরে তুই!

এইবার কনখল একটু উচ্চতরের হাসি হাসে। ভাবখানা এ ভয়তরাসে ছোট্ট মেয়েটা ভাবে কি? সে পড়বে ঘোড়া থেকে? পড়লেই হোলো?

৫

আয়েষার অনুরাগ যেন রূপকথার সোনার কাঠি। কনখলের যে চোখ সেদিন পর্যন্তও ফোটেনি, তাতে সেই সোনার কাঠি বুলিয়ে আয়েষা কনখলকে জাগিয়ে তুলেছে। চোখ মেলে কনখল ভালোবাসতে সুরু করেছে,—আয়েষাকে নয়,—সব কিছুকে। সামান্য পোকামাকড় পাখী প্রজাপতি থেকে সব মানুষ সব প্রকৃতিকে। বিরাগ বিতৃষ্ণা ঘৃণা বোধ তার মনের ভেতর থেকে মুছে যাচ্ছে—অসীম প্রেমে তার ছোট্ট বুক কানায় কানায় ভরে গেছে, সেখানে একটু ফাঁকও থাকছে না যেখানে বিরাগ বিদ্বেষ বাসা বাঁধবে।

বিচ্ছেদের দিন এসে পড়ে। হ্যাসেট খবর দিয়ে পাঠান নতুন শিক্ষানবীশ জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রবার্টস্ আসবে, তার জন্য বাগচির বাংলো ছাড়তে হবে। তবে বাগচির জন্য, যদিও টিলার ওপরে নয়, আর একখানা সুন্দর বাসা হ্যাসেটই ঠিক করে দেন। কাজীর বাজারের রাস্তায় গণি মিঞার প্রাসাদের পাশে পুরোনো সিভিল সার্জনের হাতা। বিঘে চারেক জমির ওপর একতলা বাংলো। বাবুর্চিখানা, আস্তাবল সব আছে। তদুপরি আছে সামনে প্রমাণ সাইজের ফুটবল ময়দানের চেয়েও বড়ো কম্পাউণ্ড, পেছনে প্রকাণ্ড পুকুর।

পাড়াটা একেবারে বাঙালী পাড়া। আশে পাশে ছোট বড় মাঝারি নানা সংগতির বহু ভদ্রলোকের বাস। রবার্টস্-এর পক্ষে বেখাপ্পা প্রতিবেশ, কিন্তু হ্যাসেট আশা করেন, বাগচি মানিয়ে নিতে পারবেন।

নিভাননী খুব খুশী হন। দু কারণে। অলস দুপুরে এবাড়ী ওবাড়ীর গিন্নিবান্নির সাথে গল্পগুজব করবার অবকাশ পাওয়া যাবে, আর কনখলের স্কুল কাছে হবে।

হৃষিকেশের সাহেব ঘেঁষা মনে একটু ঘা লাগলেও হ্যাসেটের প্রস্তাবে সানন্দ সম্মতি প্রকাশ করেন তিনি। আর কনখল? আয়েষাকে ছেড়ে দূরে যেতে হবে ভেবে মনমরা হয়ে যায় প্রথম দিকটায়, কিন্তু দুঃখ পুষবার মতো জায়গা মনের মধ্যে কোথায় ওর? ছুটে যায় আয়েষাদের বাংলোয় ওর যা বলবার বলতে।

আয়েষাও খবর পেয়ে গেছে রহমৎ মারফৎ। দরজা ভেজিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। পা টিপে টিপে কনখল ঘরে ঢুকতেই আয়েষার কান্নার তোড় বেড়ে যায়। কনখল গিয়ে আয়েষার পায়ের কাছে বসে। সান্ত্বনার একটি কথাও বলতে পারে না ও।

হঠাৎ আয়েষা উঠে কনখলকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। মাথায়, ঘাড়ে গালে চুমো খেতে খেতে চোখের জলে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দেয় ওর। দেখাদেখি খামখাই কনখলের দু চোখ দিয়ে ধারা নামে। নিজেকে বড়ো অসহায় মনে করে। আয়েষার কাঁধে মাথা রেখে চুপচাপ

বসে থাকে। অনেকক্ষণ দুজনের কেউই একটা কথাও বলতে পারে না।

প্রথম আবেগ কেটে যাবার পর, শ্রাবণ মেঘের আড়ালে সূর্যকিরণের মতো ভিজে দুচোখের পাতার ফাঁকে ম্লান হাসির ঝিলিক জাগে আয়েষার চোখে। ধরা গলায় বলে, —তাহলে চলে যাচ্ছিস্!

—আরে দূর! রোজ ত আসবই। পোলো মাঠে ঘোড়ায় চড়তে আসব না? এখানে থাকতে কখনো সখনো চড়তাম, এখন থেকে রোজ চড়ব। দেখিস্ তুই।

দুজনে এবারে ছাড়াছাড়ি হয়ে বসে। আয়েষা গোসলখানা থেকে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে আসে! তোয়ালে এনে কনখলের চোখ মুছিয়ে দেয়। বলে,—জানিস্, মিস্ রোজ মেরীকে ঠিক করা হয়ে গেছে। সামনের জুম্মাবার থেকে পড়াতে আসবেন।

—আমারো স্কুলে ভর্তি হওয়ার সব পাকা। সামনের বিষ্যুৎবার, বাবা বলেন গুরুবার, আমাকে নিজে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়ে আসবেন।

আয়েষার বয়স তেরো। নিভাননীর অনেক বাংলা বই, নিজেদের বাড়ীর লয়লামজনু, শিরী-ফরহাদ, গুলে বকাওলি, যা পেয়েছে, অনেক পড়েছে। কনখলের দু হাত চেপে ধরে চোখে চোখে তাকায়। ওর চোখের মণির পেছনে কি অন্তহীন সুধার সমুদ্র! বলে,—আমি তোকে ভালোবাসি, কনখল।

—আমিও তোকে ভীষণ ভালোবাসি।

একটুও দ্বিধা না করে জবাব দেয় ও। নিজের ভালোবাসার চুম্বকে কনখলের বিস্তৃত প্রেমবোধকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে আয়েষা। আজ এই একটি মুহূর্তের জন্য কনখলের মনে হয়, এ পৃথিবীব্যাপী যতো ভালোবাসার ধন আছে, যেন সবাই মিলে রূপ নিয়েছে ওই একটি মেয়ের মধ্যে। ও আয়েষার কোলে মুখ লুকোয়।

আবেগময়ী আয়েষা যেন হঠাৎ সংযত, সংহত হয়ে যায়। আস্তে আস্তে আঙুল চালায় কনখলের মাথা ভরা চুলের মধ্যে। নিজের আঙুরাখার প্রান্ত দিয়ে মুছে দেয় কনখলের উপ্‌চে ওঠা চোখের জলের ধারা। ওর স্পর্শে এবার ধাঁধা লাগে কনখলের। নিভাননীর ছোঁয়াচ পেল কোথা আয়েষা?

ওদিকে হ্যাসেট চলে যাবার পর, রহমৎ এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে মেমসাহেবকে একা পাওয়া যায় কিনা, তালাস করে বেড়ায়। নিভাননী খানা কামরার পাশের ছোট কুঠুরী থেকে চাল, ঘি, মশ্‌লা বার করছিলেন। আস্তে গিয়ে দাঁড়ায় দরজার পাশে। ডাকে, —হুজুরাইন।

—কে, রহমৎ? কি খবর? শুনেছ ত সব? আমরা পরশু বাড়ী ছাড়ব। সব গোছগাছ করতে হবে। পরশু দিনের খাবার আয়েষাদের বাড়ীতে খেয়ে নেব। তোমরা ভোরে ভোরে গিয়ে ও বাসার বিলিব্যবস্থা ঠিক করে নেবে। রাতের খানা ওখানেই। বাড়ীটা বড়ো। আরো দু একটা লণ্ঠন কিনতে হবে। টেবিলবাতিও একটা—কনা স্কুলে ভর্তি হবে, ওর পড়বার ঘরে লাগবে।

—জী মেমসাব। ও বাসায় শেষ সিভিল সার্জন ছিল মেজর গ্রীন। দুটো বাচ্চা মেয়ে, বিবি, পেছনের পুকুরে ডুবে মারা যায়। তাই ছেড়ে দিল ডাক্তার সাব। তিনজনেরই কবর আছে আস্তাবলের পেছনে ঝাউবনের ভেতর।

—ও মা, সে আবার কি রে—

—না মেমসাব, ভয়ের কিছু নেই। গোরগুলো বাংলো থেকে অনেক দূরে। তবে

শুনেছি, ডাক্তারের পরে এক ছোক্‌রা পুলিশ সাহেব দিনকত ওখানে ছিল। বেপরোয়া সাহেব। খাটিয়া খোলা-বারান্দায় টেনে রাতে শুত। মাথার তলায় থাকত কার্তুজ-ভরা পিস্তল। সাহেব ভয় কাকে বলে জানত না।

প্রত্যেক মঙ্গলবার আস্তাবলে ঘোড়া অশান্ত হয়ে উঠ্‌ত। ছট্‌ফট্ করত। খুরের খট্‌খটানিতে সাহেবের ঘুম ভেঙে যেত। সহিস ডেকে ঘোড়া সামাল করতে বলত সাহেব। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও রমজান ঠাণ্ডা করতে পারতো না ঘোড়াকে।

তারপর এক রাত্রে, সেদিনও মঙ্গলবার, সাহেব ডিনারের পর থেকে পিস্তল হাতে মোড়া টেনে আস্তাবলের দরজায় বসে থাক্‌লো। ঠিক রাত যখন একটা, ঘোড়ার দাপাদাপি সুরু হোলো। সাইকেলের একচোখো চেরাগ হাতে, পিস্তল উঁচিয়ে সাহেব আস্তাবলে ঢুক্‌ল।

কি দেখ্‌ল, সাহেবই জানে। তবে রমজানের মুখে শুনেছি, যখন বেরিয়ে এল সাহেব, ওর সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। মুখ মড়ার মতো ফ্যাকাশে, থরথর করে কাঁপ্‌ছে।

পরদিনই বাড়ী ছাড়ল সাহেব। কিন্তু কি হয়েছিল, কাউকে কিছু বলল না।

তারপর এক জজ সাহেব সেদিন পর্যন্ত ছিল ওখানে। বুড়ো সাহেব, ঘোড়াও ছিল না, আস্তাবলের দরকারও ছিল না। এই ত সেদিন রিটায়ার করে চলে গেল। জজ সাহেব শান্তিতে ছিল। দিল তড়পাবার মতো কিছু হয়নি। তার পরের ভাড়াটে, হুজুরাইন আমরা।

—মেমসাব, আমাদের কাঞ্চন আছে। আমার সাহেব যদি হ্যাসেটকে বলেন, তবে আস্তাবলটা ভেঙে দিয়ে উল্টো দিকে গণি মিঞার মোকাম ঘেসে নতুন আস্তাবল বানিয়ে দেবে এক্ষুনি। এই কথাটা বলব বলেই হুজুরাইনকে তক্‌লিফ দিলাম। গোস্তাকী মাফ্ হয়।

নিভাননী নির্বাক হয়ে সব শুনলেন। বললেন,—ভালো করেছ বলে, রহমৎ। ওই আস্তাবলের বাইরে আর কোথাও ভয়ের কিছু নেই ত?

না মেমসাব। তবে মঙ্গলবার রাত্রে, বারটা ইয়াদ্ থাকে যেন, ঝাউতলায়, আর পুকুর পারে না যাওয়াই ভালো। আর আমি থাকব কুঠিতে, কোনো ভয় ঘেঁস্‌তে পাবে না মেমসাব। খোদার দোয়ায় আমারও কিছু ক্ষমতা আছে—আমি থাকতে কনা বাবা, আপনি কি সাহেবের গায়ে কিছু আঁচ লাগবে না জানবেন।

রহমৎ চলে গেলে নিভাননী চিন্তাকুল মুখে হৃষিকেশের কাছে গিয়ে সব বললেন। হৃষিকেশ হালে বর্মাচুরুট খাওয়া ধরেছিলেন। এক মুখ ধোঁওয়া ছেড়ে বললেন,—শুনেছি বটে অফিসার মহলে ওরকম একটা কথা। তা বেশ ত। আমি এখুনি যাচ্ছি হ্যাসেটের কাছে।

পোষাক বদলে, সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাগচি।

একটু পরে হাজী ওবেদুল্লা সাহেবের দীর্ঘ, সৌম্য মূর্তি দেখা দিল টিলার চড়াইয়ে। হাঁটু ছাড়িয়ে প্রায় পা পর্যন্ত ধব্‌ধবে লম্বা কামিজ, কাঁধে কোশিদা কাপড়ের বড়ো রুমাল, মাথায় জরীর তাজ পেঁছিয়ে সাদা মস্‌লিনের সাফা। পাকা দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে। যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোনো ফেরেস্তা। নিভাননীর মন ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে।

হাজী সাহেব নিভাননীকে 'মা' বলে ডাকেন। বারান্দায় উঠ্‌তেই নিভাননী তাঁর দু হাঁটু ছুঁয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। হাজী সাহেব মাথায় হাত দিয়ে ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে অস্ফুট স্বরে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন।

নিভাননী সবচেয়ে ভালো ডেকচেয়ারটা নিজের আঁচলে ঝেড়ে সাফ্ করে ঘর থেকে

কুশন এনে পেতে দিলেন। হাত জোড় করে তস্‌রিফ্‌ রাখতে অনুরোধ করলেন।

হাজী সাহেব আসন গ্রহণ করলে নিভাননী বললেন,—শুনেছেন বাবা, আমরা এ বাড়ী ছেড়ে পরশু চলে যাচ্ছি।

—বদ্‌লির খবর এলো নাকি?

—বদ্‌লি নয়, বাবা, বাসা বদল।

—বাঁচলাম। এখনো পুরো একবছর থাক্‌তে হবে মা। খুদা মেহেরবান।

—পুরোনো সিভিল সার্জন গ্রীন সাহেবের কুঠি—বাড়ীটা খুব ভালো, তবে শুনছি বদ্‌নাম আছে বাড়ীটার।

—কেয়া, ওঁহি মোকাম—ওই গণি মিঞার পাশে? হুঁ—

বলে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন হাজী সাহেব? তারপর বললেন,—কুছ্‌ ডর নেহি বাচ্চী,—রহমৎকে বাড়ীতে রাখবে রাত্তিরে। তা ছাড়া আমি চারটে মোড়ক দেব। জুম্মাবারে আল্লার নাম করে পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, চার দিকে সন্ধেবেলা ছাদে উঠে মোড়ক চারটে ছুঁড়ে দেবে। আর ভয়ের কিচ্ছু থাক্‌বে না। আমার বেটা কোথায়? ম্যাজিস্ট্রেট সাব্‌?

—হ্যাসেটের ওখানে গেছে। রহমৎ বলছে আস্তাবলেই নাকি ভয়। উনি গেছেন ডিপুটি কমিশনারকে ধরে আস্তাবলটা ওখান থেকে সরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে।

—ঠিক্‌ করেছে! কনা বাবা কোথায়? বাড়ী ছাড়তে হবে, তাই আয়েষার হাত ধরাধরি করে দুজনে কাঁদ্‌ছে বোধহয়।

নিভাননীর মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে। একটু হেসে বলেন,—দুজনে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল, বাবা। ছেড়ে যেতে কষ্ট ত হবেই।

—দুঃখ, কষ্ট, যত হোক্‌, হতে দাও। আগুনে পড়্‌লে, তবে ত খাঁটি সোনা বেরোবে। ভালোমন্দর সাথে লড়বার শিক্ষা নিজে থেকে পেতে দাও ওকে, দুঃখ পেয়ে, প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে, ভালোবাসে। মায়ের স্নেহের আঁচল দিয়ে কতো ঘিরে রাখবে মা। কনখল বড়ো হবে, আল্লার আশীর্বাদ আছে ওর ওপর।

—কিন্তু বাবা, দেশ, সমাজ, আইন, এ সব কিছু ভালো চোখে দেখে না। কংখ্‌ ছোট আছে এখনো, আয়েষা বড় হয়েছে। ওর বয়সে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আয়েষার মায়ের যেটি গেছে, সে ত ওই বয়সেই হয়েছিল। মাঝে মাঝে আমার মন খারাপ হয়ে যায় বাবা।

হাজী সাহেব মনে প্রাণে সুফী। প্রেমই ধর্ম, ধর্ম প্রেম। অদৃশ্য জগৎ, আংশিক অদৃশ্য জগৎ, সদৃশ জগৎ, দৃশ্যমান জগৎ, কতরকমের জগৎ আছে,—যা কিছু সুন্দর, তা সে মানুষই হোক, কি প্রকৃতিই হোক, তার আকর্ষণ মনকে টানে পরম সুন্দরের দিকে। কারণ মানুষ সেই পরম সুন্দরের, ভগবানের, আল্লার, আংশিক বিকাশ মাত্র।

এত শক্ত কথা পাড়েন না তিনি। বলেন,—নিন্দা প্রশংসার উৎস হবে নিজের মন, মা, নিজের মন। সেই মনের আইনের নির্দেশে যে অবিচলিত থেকে আজীবন চলতে পারলো, তারই ত সার্থক বেঁচে থাকা। তুমি কিছু ভেবো না মা। ভালোবাসার টান শুধু শরীরের নয়—শরীর ত ধুলো মাটির। কত জন্মজন্মান্তরের বহু ভালোবাসার স্বাদ বাসা বাঁধে বুকে—সেই স্বাদ ফিরে ফিরে আসে, বারে বারে ভালোবাসায়—যাক্‌ এসব কথা। আমি যা বলতে এসেছি শোনো। আজ সন্ধেয় মিলাদ আছে দর্গায়। তোমরা সবাই আস্‌বে। রাতের খানা আমার ওখানে হবে—শুধু বিরিয়ানি, আর জর্দা পোলাও। কেমন আস্‌ছ তো?

—বাবা, আপনার ডাকে মেয়ে যাবে না, ভাবলেন কি করে!

প্রশান্ত উদার দাক্ষিণ্যে নিভাননীর কেশ স্পর্শ করেন হাজী সাহেব। আশীষ বর্ষিত হয় অকৃপণ স্নেহে। বলেন,—জাফর সাহেবের বাড়ীর সবাইকে বলতে হবে। উঠি মা। খুদা হাফিজ্‌।

হাজী সাহেব চলে যেতে না যেতে কনখল আর আয়েষা হাত ধরাধরি করে নিভাননীর কাছে এসে বসে। দুজনেই হাসিখুসি—একটু আগে যে চোখের জলের বান ডেকেছিল, কোনো চিহ্ন নেই তার। কি করে জানবেন নিভাননী যে মন দেওয়া নেওয়া খতম হয়ে যাবার পর গভীর তৃপ্তি ওদের মুখচোখ থেকে শেষ বিষাদের চিহ্নটুকুও মুছে নিয়েছে।

ওরা দুজনে দু পাশে বসে। দুজনারই মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে নিভাননী বলেন,

—আমরা যে চলে যাচ্ছি অন্য বাসায়—শুনেছিস্‌ আয়েষা?

—শুনেছিই ত। মা বলেছে পরশু দুপুরে আমাদের ওখানে তোমরা খাবে সবাই।

—তা ত খাবো। কিন্তু তোর মন খারাপ হচ্ছে না? আমার ত তোদের ছেড়ে যেতে খুব খারাপ লাগছে, আয়েষা।

কথাটা বললেন নিভাননী, খানিক সত্যি—খানিক আয়েষার মন বোঝবার টোপ হিসেবে। কিন্তু তেরোশো সতেরোর ত্রয়োদশী প্রায় যুবতী—বালা আর যৌবনের মধ্যে কৈশোরের অবকাশ তখনকার দিনের মেয়েদের থাকতো কমই। ছলাকলা আপনা থেকেই রপ্ত হয়ে যায় যুবতীর, হাতে ধরে কাউকে শেখাতে হয় না। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। আয়েষা হেসে বলল,—মন খারাপ একটু একটু যে হচ্ছে না, বলি কি করে? তবে ও বাড়ী ত খুব ভালো মাসিমা। এখানে খেলতে গেলে বাড়ী ছেড়ে মাঠে নামতে হয়, মাছ ধরতে অন্যের পুকুরে যেতে হয়, আর ও বাসায় খেলার মাঠ, পুকুর, সবই ত বাড়ীর সামিল। মিশনের টম্‌টমে রোজমেরী বিবি পড়াতে আস্‌বেন আমায়, তাঁর সাথে ঘুরে আসব তোমাদের ওখান থেকে।

আর চাঁদবিবির শিকার খেলার কি হবে? ভোলানোর জন্যে আর একটা কনাভাই পাবি কোথা?

উদ্গত অশ্রু দাঁতে ঠোঁট টিপে থামায় আয়েষা। বলে,—শিকার কনাভাই একাই খেলবে। আমি শিকারের কি জানি।

চিড়িয়া নয়, চিড়িয়ামারকে শিকার করে বসে আছে আয়েষা, ভাবেন নিভাননী। এক লহমার জন্যে বিরূপ হয়ে ওঠে মন। হাজী সাহেবের কথা মনে পড়তে সাম্‌লে নেন নিজেকে। মায়ের স্নেহের কয়েদখানায় উঠতি বয়সের ছেলেকে চিরদিন বেঁধে রাখা যাবে না, বোঝেন। বলেন, মমতাস্নিগ্ধ গলায় বলেন,

—তোর কাছ থেকে দূরে থাকতে আমরাই কষ্ট হবে রে আয়েষা। তুই যে আমার বড়ো আপনার হয়ে গিয়েছিলি।

বলে, আয়েষার দুগালে হাত দিয়ে মুখটা উঁচু করে ধরেন। তারপর কোলের ভেতরে মাথাটা গুঁজে নিয়ে পিঠে হাত বুলোন।

এইবার আয়েষার সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ পাহাড়ী নদীর ঢলের মতো কান্নার তোড়ে ভেঙে যায়। দু হাতে নিভাননীর কোমর জড়িয়ে ধরে মুখ লুকিয়ে অস্পষ্ট কান্না-জড়িত গলায় বলে,—মাসীমা—

৬

নতুন বাসায় এসে ভালোই লাগছে কনখলের। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো কৌতূহলে আনাচ, কানাচ, ঝাউতলা, পুকুর, সব সরেজমিনে তদারক করে বেড়াচ্ছে ও। একটা করমচা গাছ আছে, কাঁটাভরা ডাল ছাতার বাঁট দিয়ে নুইয়ে একরাশ ফল পেড়েছে। সাদা দুধের মতো কষ হাতে লাগবার একটু পরেই কালো হয়ে উঠছে, ভ্রূক্ষেপ নেই ওর।

আরও ফলের গাছ আছে। পেয়ারার, কাঁঠালের, ভুঁইবার। ভুঁই লকেট ফলের মতো একরকম ফল, পাকা সুপুরীর মতো রং, টকেমিশ্টিতে ভারী সুন্দর খেতে।

দিন ছ'সাত হোলো, ওরা এসেছে। আয়েষা কথা রেখেছে। বিবি রোজমেরী টম্‌টম্‌ হাঁকিয়ে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে যান ওকে। কনখল এ ক'দিনে একবারের বেশী যেতে পারেনি কাপ্তেন-সওয়ারী হয়ে পোলো ময়দানে যেতে। আয়েষা ঠোঁট ফুলিয়েছিলো, তবে সামলে গেছে। যৌবন চাঞ্চল্যে দেহমন ভরে উঠলেও বুদ্ধি বিবেচনার স্থিরতা এসেছে।

আস্তাবল পরিকল্পনা মাফিক উঠিয়ে অন্য প্রান্তে নেয়া হয়েছে। এক মণ্ডলবার কেটে গেছে, নিভাননী কান খাড়া রেখেও কিছু শুনতে পাননি রাতে। হাজী সাহেবের দেওয়া মোড়ক চারটে নারায়ণ স্মরণ করে প্রথম শুক্রবার সন্ধেতেই চার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন নিভাননী। কেবল উত্তরে, ঝাউতলার দিকে গোরস্থান পর্যন্ত পৌঁছয়নি একটা মোড়ক। অনেক আগে, অবশ্য বাবুর্চিখানা পেরিয়ে গিয়ে পড়েছে।

কুঠিতে কুঠিওয়ালা কেউ ছিল না কিছুদিন। সামনের কম্পাউণ্ড পাড়ার ছেলেদের হা-ডুডু আর গোল্লাছুট খেলার আস্তানা হয়েছিল। ছেলেরা কনখলের বয়সী দু একজন, বেশীর ভাগই তিনচার বছরের বড়ো ওর থেকে। ওর খুব ভাব হয়ে গিয়েছে পুকুর পাড়ের জমীদার প্যারীবাবুর ছেলে জীবন, আর গণি মিঞার ছেলে ইকবালের সাথে। ওরা ওর সমবয়সী। কনখল এখনো খেলায় যোগ দেয়নি, তবে ঠিক করেছে এইবার দেবে। নিপুণ হয়ে খেলা দেখে ও—খেলার উৎকর্ষের সূত্রটুক সন্ধান নেয়, কায়দা কানুন, দেখে যতটুকু পারা যায়, রপ্ত করার চেষ্টা করে। ওর ঘোড়ায় চড়ার দক্ষতা ফাঁস হয়ে গিয়েছে ছেলেদের মধ্যে, কিন্তু আর আর কেরামৎ, যথা—বন্দুকছোঁড়া, এসব এখনো কেউ জানে না।

রবিবার রাত্রে জাফর ডাক্তার সপরিবারে খাবেন ওদের ওখানে। বিকেল নাগাদ এলেন ওঁরা, বন্ধ গাড়ীতে। আয়েষার মার আপাদমস্তক বোরখা ঢাকা। আয়েষারও ঘাগ্‌রা আঙরাখার ওপর পাৎলা ফিল্‌ফিলে আশ্‌মানী রঙের ওড়না, ঘোমটার মতো কপাল ঢেকে বেঁকিয়ে ঠোঁট ঢেকে বেড় খাওয়ানো। চোখ নাক খালি বেরিয়ে আছে।

কম্পাউণ্ডের পর খোলা বারান্দা, বেশ চওড়া। তারপর ঢাকা বারান্দা, তারপর কামরা সুরু। খোলা বারান্দায় সবুজ রংকরা বেতের টেবিল চেয়ার পাতা। বাবা, ডাক্তার সাহেব, পাড়ার গণি মিঞা, প্যারীবাবু, মুরারীচাঁদ কলেজের সংস্কৃতের প্রফেসর বিদ্যাভূষণ ম'শায় সবাই সেখানে বসে। মেয়েরা অন্দরে ঢুকে গেছেন। ডাক্তার সাহেব ছাড়া আর সবাই রোজই আসেন।

গোল্লাছুট্‌ খেলায় কনখলের সেইদিনই প্রথম তালিম। খেলাটা মজার। একটা বড়ো গোল দাগের মধ্যে ছ'সাত জন দাঁড়ায়, আর ওদের দলেরই একজন শ'খানেক গজ দূরে একটা ছোটো গোলদাগের মধ্যে থাকে। প্রতিপক্ষ সবটা মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। মাঠের চৌহদ্দী কাটা আছে অবশ্যই।

বড়ো গোল দাগ থেকে এক একজন করে ছুটতে হয় যা কিছু একটা ছড়া সুর করে বলতে বলতে। ছুটদাজকে একদমে পৌঁছতে হবে শত্রুর হাত এড়িয়ে ছোট দাগে। ছোট দাগের খেলোয়াড় আবার সুর করে ফিরে আসবে বড় দাগে। মাঝপথে শত্রুকবলিত হয়ে যদি দম ফুরিয়ে যায়, তবে তাকে 'মইর' হতে হবে, অর্থাৎ খেলার মাঠের চৌহদ্দী থেকে বাইরে গিয়ে বসতে হবে। এইভাবে এক পক্ষ 'মইর' হয়ে খতম হয়ে গেলে, অপর পক্ষ দাগে ঢুকবে। এইভাবে চলবে খেলা।

কনখল প্রথম দিনের খেলাতেই উৎরে যায়। দম নিয়ে সুর ধরে সে যখন প্রথম ছুট দেয়, পাকড়ে তাকে ফেলে শত্রুরা বারবার, কিন্তু আটকে রাখতে পারে না। ছোট গোল দাগে পৌঁছাবার ঠিক আগে যখন ধরা পড়ে, তখন ঝটাপটি করতে করতে ওর দম প্রায় ফুরিয়ে আসে। গলার শির ফুলে উঠেছে, চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ভাবছে, এবার 'মইর' হওয়া ছাড়া আর গতি নেই।

ঢাকা বারান্দার বাঁ দিকের ঘরটা ওর থাকবার, পড়বার ঘর। সেই ঘরের খোলা জানলা থেকে আশমানী ওড়না বিজয় নিশানের মতো কে ওড়ায়? কনকচাঁপা রঙের সুডৌল হাত নেড়ে উৎসাহসূচক সঙ্কেত কে করে? ওর চেয়ে বেশী বয়সী, শক্তিমান প্রতিপক্ষের দুহাত থেকে সবলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এক দৌড়ে পৌঁছে যায় ছোট দাগে—গিয়ে হাঁপাতে থাকে। তাকায় নিজের ঘরের দিকে। জানলায় বিজয়লক্ষ্মীর সস্মিত সহাস্য মুখ দেখা যায় এক লহমার জন্য। তারপর জানলা বন্ধ হয়ে যায়।

খেলাশেষে দলপতি অমৃত, সেই বয়সে সবচেয়ে বড়ো আর কুস্তি করে মুগুর ভেঁজে সবচেয়ে জোয়ান—কনখলের পিঠ চাপড়ে বলে,—ক'দিনের মধ্যেই কনখল সবসে সেরা খেলোয়াড় বনে যাবে, দেখিস্‌ তোরা। অমূল্যর হাত ছাড়ালি কি করে রে কনখল? ওটার হাত দুটো তো লোহার সাঁড়াশীর মতো।

অমূল্য কাঁচুমাচু মুখে বলল,—আরে, হঠাৎ এক পা পেছনে ঝোঁক দিতেই ফস্‌কে গেল ছেলেটা। তারপর দে ছুট্‌। ছুটে ওর সাথে পারে, দলে এমন আর কেউ নেই বলে মনে হয় আমার।

খেলার শেষে সিরাপ জল খেতে দেন ছেলেদের নিভাননী। এটা বাঙালী পাড়া, নিজে বেরোন না কর্তাদের সামনে বারান্দায়। খিড়কি থেকে ইসারায় ডাকেন।

ছেলের দল দঙ্গল বেঁধে জমায়েৎ হয়। কাঁচের বড়ো বড়ো দুটো জাগ ভরা সরবৎ, গেলাসে ঢেলে দেন প্রত্যেক ছেলেকে। রহমতের হাতে খেতে বেশীর ভাগ হিন্দু ছেলেদের বাড়ীর আপত্তি উঠতে পারে আঁচ করে পরিবেশনের ভার নিজের হাতে নেন নিভাননী। ছেলেদের সাথে তাঁর ভাব হয়ে গিয়েছে এই ক'দিনে। অমৃতকে বলেন,—হ্যাঁরে অমৃত, কনা খেলতে টেলতে পারে ত?

—খুব ভালো পারে মাসিমা। দিন কতক যাক না, দেখবেন, ওর সাথে কেউ পেরে উঠবে না।

কনখল পাশ কাটিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকে যায়। পড়বার ঘরে "সখী ও সাথী"র নতুন সংখ্যার পাতা ওলটায় আয়েষা। বলে,—এই যে বীরপুরুষ। আয়, আয়। আর একটু হলেই ত 'মইর' হয়ে গিয়েছিলি।

—হলেই হোলো? অ্যায়সা তাক্‌ করে অমূল্যর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলাম নিজেকে, ও হুমড়ী খেয়ে পড়ে যায় আর কি। তারপর, বাস্‌, এক ছুটে বুড়ি।

দু'জনে দু'জনার চোখেচোখি হতে হেসে ফেলে। কনখল বলে,—তোর ওড়না দেখা মাত্তর আমার গায়ে বিশ জোয়ানের জোর এল। তারপর যখন তোর হাত নাড়া দেখলাম, আর আমাকে রুখ্‌তে পারে কেউ?

—গেঞ্জি ছেঁড়া, ইজেরে কাদা, যা ওগুলো ছেড়ে আয়।

এ পাড়ায় এসে দিন দুয়েকের মধ্যেই ধুতি পরা ধরেছে কনখল। কালোপেড়ে আটহাতি বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতি দু'জোড়া আনিয়ে দিয়েছেন নিভাননী, আর পাবনা শিল্প সঙ্গীবনীর কোরা গেঞ্জি। নিজেও পিশী পেলে বিলিতি কাপড় চোপড় পারতপক্ষে কিনতে চান না নিভাননী। এইখানে বাগচি সাহেবের হার। তাঁর নিজের পোষাক পরিচ্ছদ আসে হারম্যান, র‍্যাঙ্কিন, আর্মিনেভি থেকে। মাপজোখ দেওয়া আছে দোকানে দোকানে। দরকার মতো তাকেই সব এসে যায়। সে আমলে কলকাতার সাহেব দোকানদারেরা গেজেটে নাম ওঠা সরকারী চাকুরেদের লম্বা ধারের সুবিধে দিত। রাজার জাতের দোকানী, জানত নেটিভ্ সাহেবগুলো দাম ঠিক মিটিয়ে দেবে। ধারে জিনিষ দেওয়ার আর একটা দিকও ছিল। দশটাকার জিনিষটা কিস্তিতে দিলে পঁচিশ টাকা উসুল হোতো।

আয়েষা কনখল ছাদে উঠে গল্পগুজব করতে বসে। সূর্য সবে অস্ত গিয়েছে। পড়ন্ত আলোয় ঝাউতলার দিকে আঙুল দেখিয়ে কনখল বলে,—জানিস্, ওখানে গোরস্থান আছে।

—সে কিরে? কার?

—আগে কে ডাক্তার গ্রীন ছিল, তার মেমের আর দু'মেয়ের।

—কি হয়েছিল ওদের?

—আমাদের অমৃত বলছিল, যে মেয়ে দুটো সাঁতার জানত না। একদিন হয়েছে কি, ওরা দুটিতে পেছনের পুকুরটা দেখেছিস ত, ওই পুকুর পাড়ে খেলা করতে গিয়ে জলে পড়ে যায়। মেমসাহেব ছাদে পায়চারী করছিল, দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে, সেও ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। মেয়ে দুটো আগেই জলখেয়ে ডুবে গিয়েছিল। মেমসাহেব এক-আধটু সাঁতার জানত, চাকর খানসামা কাউকে না ডেকেই জলে নেমেছিল মেমসাহেব। লম্বা গাউন ভিজে পায়ে জড়িয়ে গিয়ে মেমসাহেব, মেয়েদের পাত্তা ত পেলই না, নিজেও ডুবে গেল। পাশের বাড়ীতে সবাইকে বলতে প্যারীবাবু এসে মেজর গ্রীনকে খবর দেন, সাহেব সেইমাত্র ফিরেছে। তারপর নাকি জালটাল ফেলে তিনজনকেই তোলা হয়। তখন সবাই মরে গেছে।

—আচ্ছা, তবে কবর বাড়ীর ভেতরে কেন? সাহেবদের ত গীর্জার পাশে মস্ত গোরস্থান আছে?

—তাও শুনেছি। সাহেব বলেছিল, সে আর চাকরী করবে না, বিলেত ফিরে যাবে। যে কটা দিন আছে, মেমসাহেবের আর মেয়েদের কাছছাড়া হতে চায় না। পাদরী সাহেব আপত্তি করেন নি, পাড়ার মাতব্বররাও 'না' বলেন নি। এ বাড়ীর হাতাও ত মস্ত। ঐ ঝাউতলার দিকে দেখ্। ওদিকটায় কোনো বাড়ীও নেই।

—ওখানটায় কোনো ঘর ছিল না কিরে কনা? ইট সুরকির মেঝের দাগ দেখা যায়?

—আরে, ঐটেই ত ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। ডাক্তার চলে যাবার পর এক পুলিশ সাহেব এ বাসায় থাকত। প্রতি মঙ্গলবার রাত্রে, দেড়টা দুটোর পর, আস্তাবলে ঘোড়া ভড়কাতো। অমনি মঙ্গলবারের এক রাত্রে সাহেব কারণ খুঁজতে আস্তাবলে ঢুকেছিল। কিন্তু সেও নাকি এত ভয় পেয়ে ছিল, যে পরদিনই বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। আমরা আসবার আগে বাবা হ্যাসেটকে ধরে আস্তাবল উঠিয়ে ইক্‌বালদের বাড়ীর দিকে নিয়ে গেছেন।

—তোরা আসবার পর এক মঙ্গলবার ত পার হয়ে গেছে। কিছু দেখেছিস, কি শুনেছিস?

—কিছু না। আর আমি ত ভালো করে সব শুনলাম সেদিন। ঐ অমৃতদের সাথে ভাব হওয়ার পর। মা বোধ হয় আগেই শুনে থাকবেন, তা না হলে আস্তাবল সরানো হবে কেন। তবে ভয় পেতে পারি বলে আমায় কিছু বলেন নি।

—ভয় পেতে পারি? তুই বলিস্ কিরে! পুলিশের ডাক্কু সাহেব ভয় পেয়ে বাড়ী ছেড়ে দেয়, আর তুই ত একরত্তি ছেলে! খবরদার, মঙ্গলবার রাত্রে একা শুবি না। মার কাছে শুবি।

এ যেন মায়ের মতো আর এক মা হুকুম করছে ছেলেকে। কনখল লজ্জা পায়, ওর রাগও হয়। বলে,—থাম্ তো তুই। আমি কারুরে ভয় পাই না। বার বার 'রাম, রাম', বলে আমি ওই কবর থেকে ঘুরে আসতে পারি রাত্তিরে, জানিস?

খুব বাহাদুর। দাঁড়া, আমি মাসিমাকে তোর মংলব ফাঁস করে দিচ্ছি আজই।

আয়েষা অকারণে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পায়চারী করে দুচার পাক। আবার ফিরে এসে বসে' স্নেহসিক্ত গলায় বলে,

—কনাভাই, আমি যদি জলে ডুবে মরে যাই, আর আমার ভূত রাত্তিরে তোর পাশে এসে দাঁড়ায়, ভয় পাবি না তুই?

—ধেৎ, তুই ত জলের পোকা। তুই ত সাঁতার জানিস।

—ইচ্ছে করে সাঁতার ভুলে যাব।

কনখল ওর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। হেসে ফেলে বলে,—চালাকী হচ্ছে। তুই জ্যান্তই আসিস্ আর তোর ভূতই আসে, আমার কাছে দুইই ভালোবাসার। ভয় পাব কেন রে!

যেন এই কথাটা বার করবার জন্যেই আয়েষার এত আয়াস। নিজে উঠে, ওর হাত ধরে টেনে তোলে। বলে,—চল যাই এবার নীচে। ফনোগ্রাফ শুনবে। কি কি যেন নতুন সব গান এসেছে বলছিলেন মাসিমা।

—চল্।

দুজনে ছাদ থেকে নেমে যায়। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। নীচে ঘরে ঘরে আলো জ্বলেছে। ওরা দুটিতে গিয়ে বসবার ঘরে মা মাসী যেখানে বসে গল্প করছিলেন সেইখানে আশ্রয় নেয়।

[ক্রমশঃ]

নৈরাজ্যবাদ : প্রজ্ঞানযুগ

অতীন্দ্রনাথ বসু

৭। জার্মানী : ম্যাক্স্ স্টার্নার (১৮০৬-১৮৫৬)

প্রুদঁর সমসময়ে রাইন নদীর অপর পারে হেগেলের আর এক শিষ্য নৈরাজ্যবাদের দিগ্‌দর্শন রচনা করেছিলেন। আদিকাল থেকে নৈরাজ্যবাদীদের তথা বামপন্থী হেগেলীয়দের দর্শনের উপজীব্য ছিল মানবতা, সমাজপ্রতীতি। এই হেগেলীয় নৈরাজ্যবাদীর সুর তাদের সংগে মিলল না। একলা পথের যাত্রী এই জাবালি কেবল ঈশ্বর ও রাষ্ট্রকে বাতিল করে ক্ষান্ত হলেন না। যাবতীয় সামাজিক নীতি বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে নেতি নেতি করে তিনি উপনীত হলেন এক নির্বিকল্প আত্মসর্বস্বতায়।

১৮০৬ সালের প'চিশে অক্টোবর ব্যাভেরিয়ার বাইরয়েট শহরে জোহান কাস্‌পের শ্মিট-এর জন্ম হয়। তরুণ বয়সে হেগেলের অন্যান্য ভক্তদের মত তিনিও ধর্ম ও দর্শন নিয়ে মেতে উঠলেন। তখন তিনি বার্লিনের একটি মেয়ে স্কুলের শিক্ষক। ১৮৪৫ সালে তিনি লিখলেন একখানি চমক-লাগানো বই—"ডের আইণ্টসিগে উন্‌ট্‌ জাইন আইগেনটুম," অর্থাৎ অহং ও তার নিজস্ব।[১] লেখক আত্মগোপন করলেন ম্যাক্‌স্‌ স্টার্নার এই ছদ্মনামে, এই নামেই অতঃপর তিনি পরিচিত হলেন। বইটি বিদগ্ধমহলে বোমার মত ফেটে পড়ল, কিন্তু বেশী কিছু ভাঙচোরা করতে পারল না; পটকার মত আওয়াজ তুলে ধোঁয়া ছড়িয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শতাব্দীর শেষে যখন নিরাজ চিন্তাধারার আদর বাড়তে লাগল সে সময়ে স্টার্নারের ভক্ত জার্মান কবি জন হেনরী ম্যাকে তাঁর জীবনী লিখলেন ও দর্শনের প্রচার করলেন। স্টার্নারের আরও গুটিকয়েক রচনা আছে, কিন্তু গডউইনের মত তাঁরও পরিচয় একখানি গ্রন্থে। অত্যন্ত অভাব ও দারিদ্র্যের ভেতর তাঁর জীবন কেটেছে। ১৮৫৬ সালে ছাব্বিশে জুন বার্লিনে চরম দুর্দশার মধ্যে তিনি নিজের জীবনের ওপর যবনিকাপাত করেন।

নেপোলিয়নের পতনের পর জার্মানীর রাজ্যগুলি যখন গণতান্ত্রিক ও একতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় আদর্শের মধ্যে দোদুল্যমান তখন হেগেল লিখলেন তাঁর যুগান্তকারী "ফিলসফি অব রাইট" (১৮২০) এবং "ফিলসফি অব হিস্ট্রী" (১৮৩১)। তিনি বললেন রাষ্ট্র এক নির্বিকল্প চিৎসত্তা যাতে বুদ্ধিমান ও নীতিবান ব্যক্তি সমাজের সংগে এক হয়ে যায়। বিশ্ব-প্রজ্ঞান মূর্ত হয়েছে রাষ্ট্রে। যে ব্যক্তি বিশ্বপ্রজ্ঞানের অংশী রাষ্ট্রকে মান্য করে সে নিজেরই প্রজ্ঞানশীল সত্তাকে মান্য করে এবং যথার্থ মুক্তির স্বাদ পায়—যে মুক্তির আধার বিশ্বপ্রজ্ঞান। প্রজ্ঞানের পরম বিকাশ হয়েছে প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রে, রাজা ও প্রজা সেখানে এক সমাজলক্ষ্যে একাত্ম হয়েছে—স্বভাব আনুগত্যে প্রজা হয়েছে স্বাধীন মুক্ত। তর্কের যুক্তিজালে বোনা ন্যায়শাস্ত্রের ঊর্ননাভ হেগেলের মুক্তি বাস্তব জীবনের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ব্যক্তির স্বাধীনতাকে গ্রাস করে এল দানবীয় দুঃশাসন রাষ্ট্র।

হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের সত্যতা প্রমাণ করল তাঁর গুরুমারা শিষ্যের দল—বাম হেগেলীয়দের হাতে প্রজ্ঞানবাদের রূপান্তর হল বিপ্লববাদে। হেগেলের অভিধানে মুক্তি

[১] নামটার ঠিক বাংলা হয় না। "ব্যক্তি ও তার স্বত্ব" এমনও তর্জমা করা যায়।

প্রজ্ঞানের আধেয়, প্রজ্ঞানের মতই আকাশস্থ বায়ুভূত। এরা শূন্যচারী মুক্তিকে নামিয়ে আনল মাটিতে, সমাজ রাষ্ট্র ধর্ম ইত্যাদি লৌকিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে। মানুষ সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হবে, অজ্ঞানের বাঁধন ছিঁড়ে সে হবে প্রজ্ঞানশীল। কিন্তু এ মুক্তি একাগ্র রাষ্ট্রানুগত্য দ্বারা লভ্য নয়, এর জন্যে চাই সমাজনিষ্ঠ কর্মপরতা, অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

এই দলের চিন্তানায়ক ছিলেন ফয়েরব্যাক, আর প্রধান পাণ্ডা ছিলেন ব্রুনো বাউয়ার। এ'রা জনকয়েক বার্লিনের হিপেল রেস্তরাঁয় এসে আড্ডা জমাতেন—আড্ডার নাম ছিল 'ডি ফ্রাইয়েন' অর্থাৎ 'দি ফ্রী' বা যারা মুক্ত। এখানে মানবাত্মার মুক্তির পথে যত কিছু বাধা সমস্তের তীক্ষ্ণ সমালোচনা হত, চার্চ স্টেট কম্যুনিজ্‌ম্‌ ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্‌ কিছু বাদ যেত না। ইস্কুলের মাস্টার মশায়টি নিয়মিত আড্ডায় হাজিরা দিতেন আর চুপচাপ এক কোণে বসে থাকতেন। তর্ক শুনতে শুনতে তাঁর মাথায় এক দুর্বুদ্ধি এল। তিনি স্থির করলেন এই ছিদ্রান্বেষীদের তত্ত্বে ছিদ্রসন্ধান করবেন, সমালোচকদের ওপর এক সর্বনাশা সমালোচনার মুষল হানবেন। এই মুষলই হল "ডের আইণ্টসিগে"।

'মুক্ত' তাত্ত্বিকরা ধর্ম রাষ্ট্র ও জাতীয়তাকে বাতিল করেছিলেন কারণ এগুলো মিথ্যার মায়াজাল ছড়িয়ে মানুষকে আবদ্ধ করে। এগুলির পরিবর্তে তাঁরা আনলেন সত্য প্রেম ন্যায় মানবতা ইত্যাদি আদর্শ। স্টার্নার বললেন এই গালভরা কথাগুলিও মিথ্যার মায়াজাল, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে শিকল পরাবার কারসাজি। যারা মানুষের প্রেমে বিগলিত তারাই মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে, এ বিষয়ে ধর্মধ্বজী ও মানবতাবাদীর মধ্যে কোন তফাত নেই। স্টার্নারের ব্যাখ্যানে অগস্টিনের ঈশ্বর আর ফয়েরব্যাকের মানুষ উভয়ই সমান মিথ্যা ও স্বাধীন ব্যক্তির সমান শত্রু।

মানুষ মুক্তির পিয়াসী, কিন্তু এমনি পরিহাস যে সে মুক্তির নামে শিকল ছিঁড়বার সংগে সংগে নূতন শিকল বরণ করে। এক স্বর্গ চূর্ণ করে সে আবার গড়ে নূতন স্বর্গ। গ্রীকদের স্বর্গ বিনাশ করেছে ইহুদীরা, ইহুদীদের স্বর্গ খৃীষ্টানরা, খৃীষ্টানদের স্বর্গ প্রোটেস্ট্যান্টরা। এক স্বর্গ যায় আর এক স্বর্গ আসে।

যে পরমাত্মার অধিষ্ঠান ছিল দেবলোকে সে আজ মর্ত্যলোকে নেমে এসেছে সত্যি, আজ তার সিংহাসন মানুষের বুকে। আজ সবার উপরে মানুষ সত্য। মানবপ্রেমিকের স্বপ্ন বুঝি এতদিনে সত্য হতে চলেছে—মানুষ নাকি পেয়েছে মুক্তির দিশা।

বর্তমান যুগে মানুষের মুক্তি-আন্দোলন তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে—প্রথম রাষ্ট্রীয়, দ্বিতীয় সামাজিক, তৃতীয় মানবিক।

রাষ্ট্রীয় আন্দোলন মানুষকে মানুষের শাসন থেকে মুক্তির রাস্তা দেখিয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ব, একের ওপর অন্যের অধিকার অন্যের রাজত্বের অবসান করেছে রাষ্ট্রীয় মুক্তি। প্রত্যেক নাগরিক অপরের হাত থেকে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকে হয়েছে রাষ্ট্রের দাস। সে এই অর্থে স্বাধীন যে তার ও রাষ্ট্রের অন্তরালে কোন মধ্যস্থ নেই, রাষ্ট্রের সংগে তার সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ। একজনের ওপর অন্যজন হুকুম চালাতে পারে না, সকলের ওপর আছে একমাত্র আইনের হুকুম।

কিন্তু যদ্যপি সকলে আইনত সমান হইয়াছে তথাপি সকলের স্বত্ব সমান

> হয় নাই। দরিদ্রের প্রয়োজন ধনীকে, ধনীর প্রয়োজন দরিদ্রকে। দরিদ্রের দরকার ধনীর ধন, ধনীর দরকার দরিদ্রের শ্রম। কেহ কাহাকেও মানুষ হিসাবে চায় না, চায় দাতা হিসাবে,—মালিক বা অধিকারী হিসাবে তাহার কিছু দিবার আছে বলিয়া। কাজেই যাহার যাহা আছে তাহা দিয়া সে মানুষ। আর এই অধিকারগত বিষয়বস্তুতে মানুষ অসমান।
>
> সুতরাং সামাজিক মুক্তিবাদ সিদ্ধান্ত করে কাহারও কোন বস্তুতে অধিকার থাকিবে না, ঠিক যেমন রাষ্ট্রীয় মুক্তিবাদ বলে কেহ হুকুম চালাইতে পারিবে না। অর্থাৎ ইহাতে যেমন হুকুম করিবার ক্ষমতা বর্তায় কেবল রাষ্ট্রে, উহাতে তেমন বিত্ত ও শ্রমের অধিকারী হয় শুধু সমাজ।[২]

এই প্রকারে ক্ষমতা ও বিত্ত হয় নৈর্ব্যক্তিক। রাষ্ট্র হয় হুজুর, সমাজ হয় মালিক।

> সর্বময় প্রভুর নিকট, নির্বিকল্প আদেষ্টার নিকট আমরা সমান হই,—সমান ব্যক্তি অর্থাৎ ব্যক্তিত্বহীন। সকল বিত্তের মালিকের কাছে আমরা সকলে হই ভ্যাগাবণ্ড। এখন একজনের কাছে আর একজন ভ্যাগাবণ্ড, নিঃস্ব। তখন পরস্পরের এই হিসাব চুকিয়া যায়। আমরা সকলে একসঙ্গে নিঃস্ব হইয়া যাই। কম্যুনিষ্ট সমাজে আবদ্ধ হইবার পর আমরা 'একদল ভ্যাগাবণ্ড' বলিয়া নিজেদের অভিহিত করিতে পারি। (১৫৪)

বাকি বৈষম্যটুকু মুছে ফেলে মানুষকে এক ছাঁচে ঢালাই করবার কাজ সমাধা করে মানবিক মুক্তিবাদ। সমাজবাদ সকলকে শ্রমদানে বাধ্য করেছে। সবাইকে খেটে খেতে হবে। কিন্তু অবসরটার কি হবে? সেটা কি যে যার খুশিমত ব্যয় করতে পারবে? নিজের স্বার্থে? মানবপ্রেমিক বলল তা নয়। অবসর নিবেদিত হবে মানবিক লক্ষ্যে। অবসর আরামের জন্যে নয়, পরার্থে উৎসর্গ করবার জন্য।

> মানবতাবাদী যে বিশ্বসমাজের আশ্বাস দেয় তার সার্বজনীন নিয়ম এই যে কোন ব্যক্তির কোন বৈশিষ্ট্য স্বীকার করা হইবে না। যাহাতে আছে কোন ব্যক্তিগত ছাপ তাহার কোন দাম থাকিবে না। এখানে যাহা কিছু মহত্ত্ব তাহা মানবতায়, যাহা কিছু নিন্দনীয় তাহা ব্যক্তিত্বে। প্রথমটিতে আছে ঈশ্বর, দ্বিতীয়টিতে শয়তান। রাষ্ট্রে যেমন স্বাধীন নাগরিকের মূল্য হারাইয়া গিয়াছে, নিঃস্ব সমাজে যেমন বিত্ত ও শ্রমের মালিকানা ডুবিয়া গিয়াছে, তেমন বিশ্বমানবের সমাজে যাহার যাহা কিছু স্বকীয়তা বিশিষ্টতা তাহা মুছিয়া গিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।...ইচ্ছা সমর্পিত হইয়াছিল রাষ্ট্রে, বিত্ত সমর্পিত হইয়াছিল সমাজে; এখন মত সমর্পিত হইল সাধারণ মানুষে, ব্যক্তিমত ডুবিয়া গেল সর্বগ্রাসী জনমতে। (১৬৮-৬৯)

এই প্রকারে মুক্তির অভিযাত্রী একের পর এক বন্ধন বরণ করে। অবশেষে তার চারদিক ঘিরে থাকে এক নিশ্ছিদ্র চক্রাকার অবরোধ। মানুষের মুক্তি, জাতির মুক্তি মানে ব্যক্তির দাসত্ব। এথেনীয়রা তাদের স্বাধীনতার স্বর্ণযুগে তাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারাকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল।[৩] অধীনতার শিকল ছেঁড়া যায়, মুক্তির শিকল ছেঁড়া যায় না।

---

[২] ইগো এণ্ড হিস ওন, অনুবাদ এস. টি. বাইংটন; নিউ ইয়র্ক, ১৯০৭, ১৫৩ পৃষ্ঠা। পরবর্তী পৃষ্ঠানির্দেশ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

[৩] সক্রেটিস

> রাষ্ট্রীয় মুক্তির অর্থ রাষ্ট্র মুক্ত, ধর্মীয় মুক্তির অর্থ ধর্ম মুক্ত, বিবেকের মুক্তির অর্থে বিবেক মুক্ত। ইহা দ্বারা বুঝায় না যে আমি রাষ্ট্র ধর্ম ও বিবেক হইতে মুক্ত। ইহার অর্থ আমার মুক্তি নয়, যে সকল শক্তি আমাকে শাসন ও দমন করিতেছে তাহাদের মুক্তি। ইহার অর্থ রাষ্ট্র ধর্ম বিবেক যাহারা আমার প্রভু তাহারা মুক্ত। রাষ্ট্র ধর্ম ও বিবেক এই প্রভুরা আমাকে দাস বানায়—যাহা তাহাদের মুক্তি তাহা আমার দাসত্ব। (১৪০-৪১)

আসলে স্বাধীনতার নিজের কোন দাম নেই। নিজের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার কাজে স্বাধীনতাকে খাটাতে পারলে তবেই তার দাম। যে মুক্তিকে কাজে লাগাতে পারে না তার বেলা মুক্তি একটি নিরর্থক অনুমতি। লোকে মুক্তি চায় নিজের জন্য, কখন বা সে স্বেচ্ছায় বন্ধনও বরণ করে। প্রেমিক ভালবাসার বন্ধনে বন্দী হয় তার প্রেমকে চরিতার্থ করবার জন্যে। মুক্তি বন্ধন উভয় কামনার উৎস যখন আমি স্বয়ং, তখন মুক্তিকে ছেড়ে আমার অহমিকার শরণ নিই না কেন?

> মুক্তির বাণী তোমাদিগকে শিখায় স্বাধীন হও, সকল বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া মুক্ত হও। ইহা শিখায় না তুমি কে। মুক্ত! মুক্ত! এই আহ্বানবাণী শুনিয়া তুমি ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছ আর স্বাধিকার হইতে মুক্ত হইতেছ, নিজ সত্তাকে বিসর্জন দিতেছ। আর আত্মবাদ তোমাকে ডাক দিতেছে নিজের কাছে, বলিতেছে 'আপনাতে ফিরিয়া এস।' মুক্তির দৌলতে তুমি অনেক কিছু হইতে মুক্ত হও আর এক নূতন পীড়ন তোমার উপর চাপিয়া বসে।...আপন মানুষ আজন্ম মুক্ত, তার শুরু হইতেই মুক্তি। আর মুক্ত মানুষ হইল স্বপ্নাবিষ্ট সম্মোহিত উৎসাহী যে মুক্তি খুঁজিয়া ফেরে। (২১৫)

মুক্তি হাত পেতে পাওয়া যায় না, জোর করে নিতে হয়। তাহলেই মুক্তিকে নিজের কাজে লাগানো যায়। তখন মুক্ত মানুষ হয় আপন মানুষ—স্বপ্রতিষ্ঠ। জনমুক্তি একটা ফাঁকা কথা কারণ জনতার কোন জোর নেই। নীরো ও নেপোলিয়নের মত অহঙ্কারীর এক ফুৎকারে জনমুক্তি উড়ে যায়।

> মুক্তি পাওয়া মানুষ মুক্ত দাস বৈ কিছু নহে—একটা ছাড়া কুকুর যেমন শিকল টানিয়া টানিয়া চলে সেই প্রকার। সে স্বাধীনতার পোশাক পরা বন্দী, ঠিক যেন সিংহচর্মাবৃত গর্দভ। (২২০)

ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ নৈতিক শাসনের আওতায় এসেছে। নাস্তিক প্রুদঁও এক চিরন্তন নৈতিক নিয়মের সন্ধানে হাতড়ে ফিরেছেন। ঈশ্বরের পবিত্র আসনে বসেছে সততা। ধর্মধ্বজী ও নীতিবাগীশ উভয়ে সমান উন্মাদ। একবিবাহ, অখণ্ড পরিবার, সন্তানবাৎসল্য অতি পবিত্র প্রথা, আর ভ্রাতাভগ্নীর সঙ্গম পাশবিক, অবিবাহিতদের যৌনমিলন ব্যভিচার! যৌন দমন পরম ধর্ম! দেহের কামনাকে উপবাসী রেখে সতীত্ব জাহির করায় কি বা মহিমা! 'এক হাজার শুচিশুদ্ধা শুষ্কা কুমারীর চেয়ে একটি লাস্যময়ী রমণীকে কে না পছন্দ করে?' (৮০)

পুরাকালে মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করত মানুষ, এখন করে নীতি ও বিশ্বাস। এ কর্তৃত্ব আরো কড়া। আগে ছিল রাজার প্রতি ভয়ভক্তি, এখন এসেছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য। অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্র ও আইনের বনিয়াদকে কেউ ভাঙতে যায় না। পিতামাতার শাসন থেকে সন্তান মুক্ত হতে চেয়েছে, পিতামাতার প্রতি কর্তব্যবোধ

থেকে মুক্ত হতে সাহস করে না। নিয়ম ও প্রথাকে ভাঙা সহজ, নীতি ও সংস্কারকে ভাঙা সহজ নয়—আর এরাই নিয়ম ও প্রথার প্রাণ।

খ্রীস্টান ধর্মে ঈশ্বরের সাম্রাজ্যের জিম্মাদার ছিল চার্চ। রিফর্মেশনের পর এর জিম্মাদার হয়েছে ব্যক্তির বিবেক। সকল পাঁড়নের চেয়ে কঠোর বিবেকের পাঁড়ন। আর একে কেউ অমান্য করতে সাহস পায়নি।

> প্রোটেস্ট্যাণ্টবাদ মানুষের উপর আনিয়াছে গোয়েন্দা পুলিসের শাসন। 'বিবেক' নামক গোয়েন্দা মনের যাবতীয় গতিবিধির উপর আড়ি পাতিয়া আছে। সকল চিন্তা ও কাজ বিবেকের একতিয়ারে অর্থাৎ পুলিসি হেফাজতে। যে মানুষকে ছিঁড়িয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও বিবেকে দুই টুকরা করিতে পারিয়াছে সেই হইল প্রোটেস্ট্যাণ্ট। (১১৫)

অথচ বিবেকের শাসনে পদে পদে অসঙ্গতি। খুন ও চুরি দুষণীয়। কিন্তু যে পরহিতে খুন ও চুরি করে লোকে তাকে ধিক্কার দেয় না। অথচ রাষ্ট্রের হাত থেকে তার নিস্তার নেই। সেখানে অন্যায় কাজ মানে বেআইনী কাজ আর ন্যায় মানে আনুগত্য। কাজেই দেখা যায় বদমাস লোকের মন্ত্রী হতে বাধা নেই আর সাধু ব্যক্তি সংবিধানের নিন্দা করলে তাকে জেল খাটতে হয়।

> আমি ভালোমন্দের তফাত বুঝি না। কাকে বলে ভাল, কাকে বলে মন্দ? আমার ভাবনা আমাকে লইয়া, আর আমি ভালও নই, মন্দও নই। আমার কাছে কোনটারই অর্থ নাই। (৬)

নীতিশাস্ত্রের বিধান—'মিথ্যা কথা বলিতে নাই।' স্বার্থবুদ্ধিও তাই বলে কারণ মিথ্যাবাদী সকলের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, সে সত্যি কথা বললেও তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। কাজেই নীতিহীন স্বার্থপর লোকও সাধারণত সত্য কথাই বলে। তা বলে সে যখন গুপ্তচর হয়ে শত্রুর শিবিরে ঢুকবে তখনও কি সে সত্যি কথা বলবে? অতএব কথা সত্য-মিথ্যার ধার ধারে না, ধার ধারে কথার মালিকের। যে সত্যের ভক্ত, সে নিজের শত্রু, তার মিথ্যা কথা বলবার মুরোদ নেই। কার্যত দেখা যায় সত্যের প্রতি অন্ধ ভক্তি কারও বড় একটা নেই, সকলেই আধা ভক্ত। তাই সাধারণভাবে মিথ্যা বলা আর শপথ নিয়ে মিথ্যা বলা দুয়ে গুরুতর পার্থক্য। সাধারণ মিথ্যা কথা ক্ষমা করা যায়, শপথের অবমাননা ক্ষমার অযোগ্য! শত্রু যদি গুপ্তচরকে ধরে শপথ নিতে বাধ্য করে তাহলে সে কি সব ফাঁস করে দেবে? সে কি শত্রুকে ধাপ্পা দেবে, না কাপুরুষের মত সত্যি কথা বলে প্রাণ দেবে?

নীতিশাস্ত্রের আর এক বিধান—'সবাইকে ভালবাসিবে'—পিতামাতাকে, দেশকে, স্বজাতিকে ও মানুষকে। ভালবাসতে হবে হুকুম মেনে। ভালবাসা পাত্রের পাওনা এবং বাসতে আমি বাধ্য। এ ভালবাসা তো আমার নয়, আমি দিই না, পাত্র আমার কাছ থেকে ভালবাসার খাজনা আদায় করে নেয়। আমি যাকে ভালবাসতে পারি না আমার ভালবাসা পাবার অধিকার তার কেমন করে আসতে পারে? একজনকে ভালবেসে তার সুখের জন্যে আমি সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি—সেও তো আমার সুখের জন্যে। সব দিয়ে মন ভরে যায়, প্রেমের এই আত্মনিবেদনেই আত্মতৃপ্তি। সর্বস্ব দিয়েও যা নিজস্ব তা থাকে। প্রেমিক যখন নিজেকে ভুলে যায় তখন সে বিকারগ্রস্ত। মানুষকে যে আমি ভালবাসি, সে ভালবেসে সুখ পাই বলে, নিঃস্বার্থভাবে কিংবা নীতির শাসন মেনে নয়।

> যখন আমি নিজের স্বার্থ বুঝিয়া আত্মসচেতন হইয়া ভালবাসি, যখন আমি কর্তা

> পাত্র কর্ম, আমার ভালবাসার বিষয়—তখনই আমার ভালবাসা আমার নিজস্ব হয়। আমার বিষয়ের কাছে আমি কিছু ধারি না, ইহার প্রতি আমার কোন কর্তব্য নাই; ঠিক যেমন আমার চোখের প্রতি আমার কোন কর্তব্য নাই। তাহা সত্ত্বেও আমি যে খুব সাবিধানে ইহাকে রক্ষা করি সে আমার নিজের জন্য। (৩৯০)

সত্যের জন্যে কেন প্রাণ দেব? ন্যায়ের জন্যে কেন সব বিসর্জন দেব? কেন তামিল করব ভালবাসার হুকুম? সত্য ন্যায় ও ভালবাসার জন্যে আমি, না আমার জন্যে সত্য ন্যায় ও ভালবাসা? আমার চেয়ে বেশী দাম আমি কাকেও দিই না।

> দৈব বস্তু দেবতার একতিয়ার, মানবিক জিনিস মানুষের একতিয়ার। আমার মাথাব্যথা দৈব কিংবা মানবিক বিষয় লইয়া নয়, আমার মাথাব্যথা অতি সহজ সরল আমাকে লইয়া। এবং এই আমি একটি সাধারণ সত্তা নই। আমি সকল হইতে স্বতন্ত্র—যাহা আমার তাহাও স্বতন্ত্র। (৬)

শুধু নীতিশাস্ত্র নয়, পণ্ডিতরা চিন্তাভাবনাকেও ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। দার্শনিক দেকার্ত বলেছেন—'আমি ভাবি তাই আমি আছি।' আমার ভাবনায় আমার অস্তিত্ব। আমি কেবল ভাবুক মন—আমার দেহটা কিছু নয়। প্রকৃতির বেলাও তাই। সেখানেও এক শাশ্বত নিয়ম বা প্রজ্ঞান পরম সত্তা। ভাবনার জন্ম হয়েছিল ব্যক্তি ও তার বস্তুবোধ থেকে, এখন ভাবনাই হল আধার, ব্যক্তি ও বস্তু হল আধেয়। হেগেলের দর্শনে পরম প্রজ্ঞান স্বৈরশাসনের শিখরে আরোহণ করল, চিৎশক্তি হল সর্বগ্রাসী, ঐশ্বরিক ভাবনায় বিলীন হল ব্যক্তি ও বস্তু।

কি তাজ্জব কথা! সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু নির্বোধ দৈনন্দিন ঘটনা ও আচরণগুলি অতিমাত্রায় বাস্তব।

> ঠিক এই জন্য তাহাকে দার্শনিক বলা চলে না, যাহার চক্ষু পার্থিব বস্তুর প্রতি সদা উন্মুক্ত, যাহার দৃষ্টি অবাধ পরিচ্ছন্ন, দুনিয়া সম্বন্ধে যাহার বিচার অভ্রান্ত, যে দুনিয়াকে দুনিয়া বলিয়াই, বিষয়কে বিষয় বলিয়াই জানে, এক কথায় যে সব জিনিসকে দেখে নেহাৎ গদ্যময় ভাবে। দার্শনিক বলা যায় তাহাকে যে পৃথিবীতে দেখে ও দেখায় স্বর্গ, লৌকিকে অলৌকিক, ভৌতিকে দৈব। প্রথম জনের আছে কেবল ইতর চেতনা, আর যে দৈবকে জানে এবং দৈবের কথা বলিতে পারে তাহার চেতনা বৈজ্ঞানিক। এই কারণে বেকনকে দার্শনিক জগত হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। (১১১)

দার্শনিকরা বস্তুজগতকে উল্‌টিয়ে করেছে ভাবজগত। হৃদয়ের ভাব প্রেম, হৃদয়ে প্রেম থাকুক আর না থাকুক। চিন্তার ভাব সত্য, তা চিন্তা যতই কেন না বিভ্রান্ত হোক।

সম্প্রতি অচল চিন্তা ও সচল চিন্তার মধ্যে তফাত বের করার রেওয়াজ হয়েছে। আসলে তফাত কিছু নেই। উভয়েই সত্যের পূজারী। স্থির বোধ্য সত্যকে আঁকড়ে থাকে, অস্থির সন্ধানী সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। সত্য মাত্রই স্থানু। সত্যার্থীর সচল চিন্তা এই অচলায়তনে বন্দী হবার জন্যে ছুটে চলেছে। সে মনে করে তার চিন্তা সকল সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত, বিশুদ্ধ বুদ্ধিচারী। যদি থাকে কারও এমন মুক্ত বুদ্ধিসর্বস্ব চিন্তা তা হলে সে চিন্তার দাস। আমি চিন্তার নই, চিন্তা আমার। চিন্তা ব্যক্তির কর্ম। আমি ভাবনায় ডুবে থাকতে পারি, নির্ভাবনায় বসে থাকতেও পারি। একে মুক্ত চিন্তা বলে না, বলে আমার চিন্তা। ভাবনার আরম্ভ চিন্তাকে নিয়ে নয়, আমাকে নিয়ে,

এর লক্ষ্যও চিন্তা নয়, লক্ষ্য আমি, আমার খেয়াল, খুশি। চিন্তা আমার কাজ, আমার অধীন—যা আমি পেতে চাই তা আমি চিন্তা করি।

> আলাদা করিয়া দেখিতে গেলে সকল সত্যই মৃত, শব। যে হিসাবে আমার ফুসফুস জীবিত সে হিসাবে সত্য জীবিত। ফুসফুসের জীবন নিরূপিত হয় আমার জীবনীশক্তি দিয়া, তেমন সত্যেরও। সত্য সব্জি ও আগাছার মত বস্তু, সব্জি না আগাছা সে বিচার আমার।...সত্যের সেবা করা আদৌ আমার ইচ্ছা নয়। আমার কাছে সত্য শুধু আমার ভাবুক মস্তিষ্কের খাদ্য, যেমন আমার পাকস্থলীর খাদ্য আলু অথবা আমার সামাজিক হৃদয়ের খাদ্য এক বন্ধু। (৪৭৩)

ফরাসী বিপ্লবের আগে মানুষ ছিল গোষ্ঠীর প্রজা। অভিজাত, যাজক, কারিগর ইত্যাদি সকলে ছিল যে যার গোষ্ঠীর অধীন, রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল গোষ্ঠীর মারফত। গোষ্ঠীগুলি মর্যাদা অনুসারে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বিপ্লবের পর তৃতীয় শ্রেণী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কৌলীন্য নষ্ট করে দিল, সব মিলে হল এক জাতি, জাতির নির্বিকল্প প্রভু হল জাতীয় রাষ্ট্র। গোষ্ঠীর মধ্যস্থতা রইল না, ব্যক্তি হল রাষ্ট্রের নাগরিক। তার কোন বৈশিষ্ট্য থাকল না, তার ব্যক্তিত্ব ডুবে গেল রাষ্ট্রের সার্বিকতায়। সকলের সমান অধিকার—তার মানে কারও স্বাতন্ত্র্য নেই। সকলে রাষ্ট্রের বশংবদ। তফাত এই যে আগে সে ছিল ব্যক্তির তাঁবেদার, এখন সে হয়েছে আইনের তাঁবেদার। ব্যক্তি মুক্ত হল না, মুক্ত হল নাগরিক, মানবজাতির অন্যতম একজন মানব।

যতক্ষণ আইন আছে ততক্ষণ রাষ্ট্র আছে, আইন না থাকলে রাষ্ট্রও নেই। আর লোকে মানলেই আইন আছে না মানলে নেই। যার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা আছে সে রাষ্ট্রের অভিপ্রায় আইনের তোয়াক্কা করে না। সুতরাং রাষ্ট্রের সর্বদা সজাগ দৃষ্টি যাতে কারও কোন স্বাধীন ইচ্ছা না থাকে। কোথাও তিলমাত্র স্বাধীন চিন্তার বা ইচ্ছার আভাস পেলে সে খড়্গহস্ত। উদারনীতি ও সহনশীলতা রাষ্ট্রের স্বভাববিরুদ্ধ।

> রাষ্ট্র মাত্রই স্বৈরাচারী—তা শাসক একজন অনেকে কিংবা সকলে যাই হোক না কেন। একে অন্যের উপর স্বেচ্ছাচার চালায়। যখন জনপরিষদের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া আইনের রূপ নেয় এবং সেই আইন ব্যক্তির উপর প্রযুক্ত হয়, ব্যক্তি সেই আইন মানিতে বাধ্য হয়, তখনও তাহা একের উপর অপরের স্বেচ্ছাচার হইয়া দাঁড়ায়। যদি এমনও ধরা যায় যে প্রত্যেক ব্যক্তি একই ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছে এবং এক সম্মিলিত অভিপ্রায় আইনে মূর্তি পাইয়াছে তাহা হইলেও ব্যাপারটা একই রকম দাঁড়ায়। ইহাতে আমি কি আজ গতকালের ইচ্ছা দ্বারা আবদ্ধ হই না? আমার ইচ্ছা জমিয়া স্থির হইয়া যাইবে। আমার এক মুহূর্তের অভীপ্সা, যাহা আমার সৃষ্টি, সে হইবে আমার আদেষ্টা।...আমি যদি গতকাল নির্বোধ হইয়া থাকি তবে সারা জীবন আমাকে তাহাই থাকিতে হইবে। (২৫৬-৫৭)

কোন সার্বজনীন আদর্শের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিকে দমন করা, বশ করা, পোষ মানানো, এ ছাড়া রাষ্ট্রের আর কোন লক্ষ্য নেই। তার পরমত সহিষ্ণুতা শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ পরমত তার পক্ষে নিরাপদ। পৃথিবীর ইতিহাস প্রমাণ করে যে মানুষের ওপর কোন বন্ধন টিকে থাকে না, বাঁধন ছেঁড়া উচ্ছৃঙ্খল তার স্বভাব। তবুও মানুষ বারবার উদ্ভাবন করে নূতন বন্ধন, মনে করে একটি মুক্ত সংবিধান বা গণতান্ত্রিক কাঠামো গ্রহণ করে সে ঠিক বন্ধনটিকে

বরণ করেছে। আদর্শবাদীর মস্ত বড় আশা প্রজাতন্ত্রে কোন সরকারী শাসন থাকবে না, থাকবে কেবল কার্যকরী ক্ষমতা যা জনতার হাত থেকে পাওয়া এবং জনতার অধীন। হায় অন্ধ বিশ্বাস! জনতার ভিতর থেকে উদ্ভূত হলেই কি ক্ষমতা জনতার বশীভূত থাকে? মায়ের নাড়িছেঁড়া শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরও কি থাকে মায়ের জিনিস?

মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র গড়েনি। রাষ্ট্র আছে আপনার জোরে। সে চায় আমি তার নৈতিক শাসন মানবো, অপরের প্রতি আমার কর্তব্য সে স্থির করে দেবে। সে সমাজের অভিভাবক, সমাজকে আমি কি দেব না দেব সে বিচার তার।

> আমি আত্মম্ভরি, আমার অন্তরে মানবসমাজের হিত চিন্তা নাই। আমি ইহার জন্য কোন ত্যাগস্বীকার করি না, বরং ইহাকে আমার কাজে লাগাই। আর ইহাকে কাজে লাগাইতে হইলে নিজের খুশিমত গড়িয়া লই, আমার বিষয়ে পরিণত করি। অর্থাৎ ইহাকে আমি ধ্বংস করিয়া ইহার জায়গায় একটি আত্মপরদের সম্মিলন গঠন করি। (২৩৪)

এ কাজ অসম্ভব নয়। যদি আমি কোন দায় গ্রহণ না করি, কোন আইন স্বীকার না করি, কোন বন্ধনে আত্মসমর্পণ না করি, তা হলে কোথায় থাকবে রাষ্ট্র, কোথায় থাকবে সমাজ? আমি অপরাধী হব। আইন ও অপরাধের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। রাষ্ট্রের জবরদস্তির নাম আইন, ব্যক্তির জবরদস্তির নাম অপরাধ। রাষ্ট্রের জবরদস্তিকে উৎখাত করতে হলে অপরাধ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তুমি যখন বল আমি দোষী তখন ধরে নাও তোমার দোষগুণের বিচার নিয়ে আমাকে চলতে হবে। অর্থাৎ সকলের হবে এক লক্ষ্য, এক নৈতিক মান। কোন লক্ষ্য ও মানকে অভ্রান্ত পবিত্র বলে ধরে নিলেই তবে তার ব্যতিক্রম হয় অপরাধ, আর আমি কোন কিছুকে অভ্রান্ত পবিত্র বলে মনে করি না। একজনের বিরুদ্ধে আর একজন বিপক্ষ হতে পারে, অপরাধী নয়। ভাবনা জরাগ্রস্ত হলে আসে অপরাধের ধারণা। মানুষের ভাবনা স্থবির হয়ে গুটিকয়েক অনড় সত্যের অচলায়তনে বসে অপরাধ নিয়ে মাথা ঘামায়।

> চার্চের ছিল মারাত্মক পাপ, রাষ্ট্রের আছে প্রাণান্তক অপরাধ। চার্চের ছিল ধর্মদ্রোহী, রাষ্ট্রের আছে দেশদ্রোহী। চার্চের ছিল প্রায়শ্চিত্ত, রাষ্ট্রের আছে শাস্তি। এক কথায় ওখানে পাপ এখানে অপরাধ, ওখানে পাপী এখানে অপরাধী। চার্চের পবিত্রতার মত রাষ্ট্রের পবিত্রতারও কি অবসান হবে না? (৩১৫)

হেগেলের দর্শনে সমাজ জৈববধর্মী। তার দেহ আছে, প্রাণ আছে, চিন্তাভাবনা আছে। সমাজের ভাবনা যুগমানস, তা থেকে উত্থিত হয় ব্যক্তির ভাবনা। সমাজচেতনার পরিবেশে লালিত হয় ব্যক্তির চেতনা। বাম হেগেলীয়রা এ তত্ত্ব অস্বীকার করেনি। কিন্তু কোথায় এ সমাজদেহ আর কোথায়ই বা সমাজচেতনা? আমার নিজের মাথায় ছাড়া আমি তো আর কোথাও কোন চেতনা খুঁজে পাই না। এর ওর তার একটি করে দেহ আছে, ভাবনা আছে, সব মিলে আছে এক গোছা দেহ আর অজস্র ভাবনা, সমাজদেহ ও সমাজমানসের হদিস কোথাও মেলে না। সমাজ জিনিসটাই একটা ধোঁয়াটে কল্পনা যা ব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

> বরাভয়দাতা এই সমাজ আর এক ভৌতিক মায়া, এক নূতন প্রভু, নূতন 'পরম সত্তা', যাহা আমাদিগকে দিয়া দাসত্ব করাইতেছে, আমাদের আনুগত্য লইতেছে। (১৬২)

সমাজ আমাকে কিছু দেয় না, দিতে পারে না। সমাজ আছে আমার কাজ আদায়ের জন্যে, আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। আমার যা কিছু বলিদান তা সমাজের কাছে নয়, আমার

কাছে, আমার জন্যে। সমাজবাদীরা সমাজকে মনে করে পবিত্র, যেমন মানবতাবাদীরা মানুষকে মনে করে পবিত্র। ধর্মান্ধদের ন্যায় এরাও অন্ধ বিশ্বাসের দাস।

মানবতাবাদীরা রাষ্ট্র ও সমাজের গণ্ডি বাড়িয়ে দিয়ে করেছে মানবজাতি। এতে ব্যক্তির দাসত্ব আরো কঠোর হয়েছে। রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের চেয়ে বিশ্বপ্রেমিকদের শাসন একটুও শিথিল নয়।

ফয়েরব্যাক বলছেন 'মানুষের কাছে মানুষই পরম সত্তা'। আর ব্রুনো বাউয়ারের বচন 'মানুষ সদা আবিষ্কৃত হইয়াছে।' এই পরম আবিষ্কারটি কি? না—ঐশ্বরিক মানুষ। ধর্মশাস্ত্র বলেছিল ঈশ্বর মানবরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। ফয়েরব্যাক বলছেন মানব ঈশ্বরত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে, মানুষ ঐশ্বরিক গুণ, ঐশ্বর্য অর্জন করেছে। আগে বলা হত ঈশ্বর প্রেম, এখন বলা হয় প্রেম ঐশ্বরিক। অর্থ এক, শুধু শব্দের হেরফের।

ফয়েরব্যাক যখন বলেন মানুষের সত্তা দৈব, ঐশ্বরিক, তখন তিনি মানুষকে সত্তা ও অসত্তায়, সার ও অসারে ভাগ করেন। আমি যতটুকু রক্তমাংসের মানুষ ততটুকু আমি অসার। তা থেকে আমার সারবস্তু দৈবসত্তা বিচ্ছিন্ন।

> আমি ঈশ্বর নই মানবও নই, পরম সত্তা নই আমার সত্তাও নই। সুতরাং এই সত্তাকে আমি নিজের ভিতরেই দেখি আর বাহিরেই দেখি তাহাতে কিছু আসে যায় না।...ফয়েরব্যাক যদি এভাবে সত্তার স্বর্গীয় ঘরবাড়িগুলি ভাঙিতে থাকেন আর তাহাদের তল্পিতল্পা সহ আমাদের ঘাড়ের উপর চালান দেন তবে এই ভগ্নস্তূপ দেহগুলি যে ভিড়ের চাপে মারা পড়িবে। (৪১-৪২)

বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিকদের হাতে আজ ঈশ্বর ধরাশায়ী হয়েছে, কিন্তু মানুষ উঠেছে আকাশে, আরম্ভ হয়েছে মানব-পূজন।

> আমাদের বহির্ভূত স্বর্গলোককে অপসারণ করিয়া বিপ্লবযুগের প্রজ্ঞানীরা তাহাদের কাজ সমাধা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের অন্তর্গত পরলোক এক নূতন স্বর্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার স্বর্গ ভাঙিবার ডাক আসিতেছে। ঈশ্বরকে জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে, কিন্তু আমাদের কাছে নয়—মানুষের, মানবতার কাছে। (২০২)

ব্যক্তি থেকে তার কয়েকটি স্বভাব ও গুণকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে সংজ্ঞা দেওয়া হয় মানুষ। মানবতাবাদী আমাকে দেখে না, দেখে আমার কয়েকটি গুণকে ও ভাবকে। খ্রীষ্টানদের মত সেও দেহধারী জীবন্ত মানুষকে অবজ্ঞা করে। খ্রীষ্টান আমাকে বাদ দিয়ে দেখে আমার আত্মা, সে আমাকে বাদ দিয়ে দেখে আমার মানবতা।

> মানবতার ধর্ম খ্রীষ্টান ধর্মের সর্বশেষ রূপান্তর। মানবতাবাদ এক ধর্ম, কারণ ইহা আমার সত্তাকে আমা হইতে পৃথক করিয়া আমার উপরে বসায়। অপর ধর্ম যেমন ঈশ্বর বা ঈশ্বরের বিগ্রহকে আকাশে উঠায় ইহা মানুষকে তেমন মহা উচ্চে স্থাপন করে, যাহা আমার গুণ ও ভাব তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সত্তা নাম দিয়া আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করায়।...মানবতাবাদ বিশ্বাসে ধর্ম, কাজেও ধর্ম। কারণ, ধার্মিকদের মত ইহাও পরম সত্তা মানুষের নামে গোঁড়ামির আকাঙ্ক্ষী। ইহা বলে 'মানবতার বিশ্বাস একদিন তাহার জ্বলন্ত আবেগ লইয়া দেখা দিবে, যে আবেগকে দমন করিবার সাধ্য কাহারও হইবে না'।[৩] (২২৯)

[৩] ব্রুনো বাউয়ারের জুডেনফ্রাজ, ৬১ পৃষ্ঠা

এই হল মানুষ, আমাদের সত্তা, আমাদের প্রভু পরম ও পবিত্র।

> মানুষ হইল শেষ অশুভ প্রেতাত্মা, আমাদের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ, তাই সর্বাপেক্ষা ছলনাময়, ভদ্রবেশধারী পরম ধূর্ত মিথ্যুক, মিথ্যাবাদের জন্মদাতা পিতা। (২৪০)

পুরাকালে ঐশ্বরিক বিচার ছিল মানুষের বিচারের ওপরে, এখন মানুষের বিচার এসেছে ব্যক্তির বিচারের ওপরে। মানবিক বিচার বিদ্যা, ব্যক্তির বিচার অবিদ্যা। অথচ এই অবিদ্যাই বাস্তব, কারণ তুমি আমি বাস্তব, তোমার আমার বিচারবুদ্ধিই বাস্তব। এর বাইরে কিছু নেই, কোন বিচারবুদ্ধিও নেই।

কে ভাঙবে এই মায়াপুরী, আত্মার সাম্রাজ্য? তুমি, আমি, অহংকারী ব্যক্তি।

> বেদী ঘিরিয়া গির্জার খিলান উঠিয়াছে, ইহার প্রাচীর ক্রমশ বাহির দিকে বিস্তরমান। প্রাচীর ঘিরিয়া আছে পূত বিগ্রহকে। তুমি উহার কাছে যাইতে পারিবে না, উহাকে ছুঁইতে পারিবে না। ক্ষুধার পাঁড়নে চিৎকার করিয়া তুমি সামান্য একটু অশুচি কণার জন্য প্রাচীরের চারিধারে ছুটিয়া বেড়াইতেছ আর তোমার পরিক্রমা ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে। অবিলম্বে গির্জার দেওয়াল সারা পৃথিবীকে গ্রাস করিবে আর তুমি বিতাড়িত হইবে শেষ প্রান্তে। আর একপদ অগ্রসর হইলেই পবিত্র গির্জার জয়, আর তোমার রসাতলে পতন। সুতরাং সময় থাকিতে সাহসে ভর করিয়া লম্ফ দাও, প্রাচীর ডিঙাইয়া বেদীমূলে হানা দাও। যদি শুষ্ক কদন্নের আশা ছাড়িয়া দিয়া নৈবেদ্যের পরমান্ন গ্রাস করিতে পার, তাহা হইলে সকল পবিত্র বস্তু তোমার হইবে। ঐ যজ্ঞের হবি পান করিয়া হজম কর তবেই তুমি ঐ পুণ্যগ্রহ হইতে মুক্ত হইবে। (১২৬-২৭)

তবে কি সামাজিক জীবন বলে কিছু থাকবে না? প্রেম সখ্য সৌভ্রাত্র সব লোক পাবে? কখনই না। আমি অন্যকে চাই, তাই খুঁজবো বন্ধু, সহচর, সখা। আমি নির্বিকল্প মানুষকে চাই না, চাই ব্যক্তিকে,—একে ওকে তাকে, আমার নিজের দরকারে, আমার কাজ হাসিল করতে।

> আমি দেখিতে পাই লবণ আমার খাদ্য সুস্বাদু করে তাই ইহা আহার্যে গুলিয়া ফেলি। মাছে আমি রুচি পাই তাই ইহা খাই। তেমনি তোমার মধ্যে আমি এমন কিছু খুঁজিয়া পাইয়াছি যাহা আমার ভাল লাগে, কাজেই তোমাকে আমার সখাত্বে নির্বাচন করিয়াছি।...আমার যাহা প্রয়োজন তাহা দিয়া আমার কাছে তোমার পরিচয়। তুমি আমার বিষয়, আমার পাত্র এবং তাই আমার সম্পত্তি। (১৮৩)

এই প্রকারে আত্মপর আত্মপরের সঙ্গে মিলবে যার যার নিজের তাগিদে। সাবালক হবার আগে পুত্র পিতার সঙ্গে আবদ্ধ থাকে, সে পরিবারের অধীন। সাবালক হবার পরে পুত্র স্বাধীন হয় এবং নূতন করে পিতাপুত্রের সম্পর্ক রচিত হয়। পুত্র পুত্রই থাকে পিতা পিতাই থাকে কিন্তু পুত্রত্ব ও পিতৃত্ব আর তাদের সবটুকু পরিচয় নয়।

ঈশ্বরের ও রাষ্ট্রের বন্দনা আর মানবতা ও মুক্তির কীর্তন উভয়ই মোহগ্রস্ত মনের বাতিক। সত্য, ন্যায়, প্রেম ইত্যাদি ধর্ম যার ওপর সমাজ দাঁড়িয়ে আছে বলে আমরা মনে করি আসলে সেগুলি বিকারগ্রস্ত মনের উদ্ভট অলীক কল্পনা। আমরা পাগলা গারদের উন্মাদ, নিজের কল্পিত ছায়ামূর্তিগুলিকে নিজের মাথার ওপরে বসিয়ে ভক্তিভরে পুজো করছি—স্বপ্নলোকে বাস করছি আর স্বপ্নদেবতার ভজন করছি।

হে মানব! তোমার মাথায় ভূতের নৃত্য চলিয়াছে। তোমার মাথায় ঘুরিতেছে চাকার পর চাকা। কত মহান বস্তু তুমি কল্পনা করিয়াছ, কত রাজ্যের দেবতা আনিয়া হাজির করিয়াছ—এই ভৌতিক জগত তোমাকে ডাক দিতেছে, ইহার মায়া তোমাকে ইশারা করিতেছে। তোমার মাথায় এক বাতিক বদ্ধমূল হইয়াছে। (৫৪-৫৫)

সিন্ধবাদের ঘাড়ের ওপর দৈত্য চেপে বসেছে, তাকে ঝেড়ে না ফেললে নিস্তার নেই। যখন মানুষ আত্মিক ধারণাগুলিকে ভূমিসাৎ করে নিজের সহজ ইচ্ছায় ফিরে আসবে তখন সে হবে সার্থক। এতদিন সে যার পরিচর্যা করেছে, তখন সে হবে তার পরিচারক।

ভৌতিক সমাজে অধিকার ভিক্ষার দান। সদ্যোজাত শিশুকে যদি বাঁচতে দাও তবে তার বাঁচবার অধিকার আছে, নচেৎ নেই। স্পার্টানরা তাদের শিশুদের এ অধিকারও দিত না, তাই তাদের জীবনের অধিকার ছিল না। অনুগ্রহের দেওয়া অধিকার এক জিনিস, কেড়ে নেওয়া অধিকার অন্য জিনিস। শিশুদের জোর নেই তাই অধিকার নেই, যে সব জাতি শৈশব অবস্থায় আছে তাদের অধিকারও শিশুর অধিকারের সামিল। শুধু ছাড়পত্র পেলেই অধিকার জন্মায় না, অধিকার খাটাবার মত জোর থাকা চাই।

> যাহা করিবার তোমার ক্ষমতা আছে তাহা করিবার তোমার অধিকার আছে। আমার সকল অধিকার ও সমর্থন নিজের কাছ হইতে পাওয়া। যাহা কিছু লইবার এবং করিবার আমার ক্ষমতা আছে আমি তাহারই অধিকারী। যদি আমি জিউস, জিহোবা অথবা ঈশ্বরকে উৎখাত করিতে পারি তবে সে অধিকার আমার আছে। আর যদি তাহা না পারি তাহা হইলে সর্বদা আমার উপর এই দেবতাদের অধিকার ও ক্ষমতা থাকিবে। আমি অক্ষম বিস্ময়ে তাহাদের অধিকার ও ক্ষমতার দিকে তাকাইয়া থাকিব, তাহাদের হুকুম তামিল করিব, তাহাদের অধিকার অনুসারে কাজ করিয়া মনে করিব ঠিক করিতেছি—যেমন বুশ সাঁমান্তরক্ষী পলায়মান ব্যক্তিকে সন্দেহবশে গুলি করিয়া মনে করে সে ঠিক কাজ করিয়াছে, কারণ সে হত্যা করিয়াছে উপরওলার হুকুমে আইনমাফিক। কিন্তু আমি যদি স্বেচ্ছায় হত্যা করি, স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করিয়া, হত্যা অন্যায় এই সংস্কারের ভয়ে নিবৃত্ত না হইয়া, তাহা হইলে সে হত্যায় আমি অধিকারী।...যদি আমার কাছে কাজটা ঠিক মনে হয় তবে ইহা ঠিক। হইতে পারে অপরের কাছে কাজটা ঠিক মনে হইবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট নয়। সে ভাবনা তাহাদের আমার নয়। তাহারা সাধ্যমত আত্মরক্ষা করুক। (২৪৭-৪৮)

জন্মগত অধিকার কথাটা খুব চলতি। এটা কি বস্তু? রাজকুমারের সিংহাসনে জন্মগত অধিকার, শ্রমিকের পুত্রের কয়লাখাদে খাটিবার জন্মগত অধিকার, ভিক্ষুকে সন্তানের ভিক্ষা করিবার জন্মগত অধিকার আছে বটে। আবার এমন ছেলেও আছে যারা এসব পৈত্রিক অধিকারকে স্বীকার করে না, যারা নিজের অধিকার নিজ হাতে গড়ে। তুমি নিজের জন্মগত অধিকার বজায় রাখবার জন্যে যতই চিৎকার কর না কেন, এরা এদের অর্জিত অধিকার নিয়ে তোমার ওপর হামলা করবে। যখন বাহুবল এসে অধিকারকে গিলে ফেলে তখন তার কোন চিহ্ন থাকে না।

অধিকার স্থির হয় যার যার আগ্রহ ও ক্ষমতার মাপে। জন্মাধিকার, প্রকৃতিদত্ত অধিকার, সার্বজনীন অধিকার এ-সব ভৌতিক মায়া।

বিত্তাধিকারও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। জোর যার মুলুক তার—অধিকার ও বিত্ত কোন ছার। আমি যে সম্পত্তি দখল করতে পারি সে সম্পত্তির আমি অধিকারী। গরীবদের কি হবে? তারা কি বিত্তের ভাগ পাবে না? তারা আত্মম্ভরিতা হারিয়েছে, নিজের দাম ভুলে গেছে তাই তাদের দুঃখ ঘোচে না। প্রেম বিলিয়ে, জবরদস্তি ধনবণ্টন করে ধনবৈষম্য যাবে না।

> সকলের বিরুদ্ধে সকলে লড়াই করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিবে। দরিদ্ররা মুক্ত ও বিত্তবান হইবে বিদ্রোহ করিয়া। (৩৪৩-৪৪)

সম্পত্তি প্রথা রদ করা যায় না। ভূতের হাত থেকে সম্পত্তি কেড়ে আপনার করে নিতে হয়। যে আত্মম্ভরি সে সম্পত্তিকে মান্য করে না,—তা ব্যক্তির হোক আর সার্বজনীন হোক। যৌথবিত্ত থেকে আমাকে এক টুকরা ভাগ দেবে আর তাই নিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এ আমার স্বভাব নয়। আত্মম্ভরি দরিদ্রকে বলে না যতদিন না এক অভিভাবক সমিতি বসে সমাজের নামে তোমাদের কিছু খয়রাত করে ততদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর; বরং বলে যা তোমার চাই তা নিয়ে বসে থাক।

> কম্যুনিস্টরা বলে ন্যায়ত জমি তার যে জমি চাষ করে, ফলন তার যে ফসল ফলায়। আমি বলি জমি তার যে জানে কেমন করিয়া ইহা লইতে হয়, অথবা যে দখলী জমি হাতছাড়া হইতে দেয় না এবং কাহাকেও কাড়িয়া লইতে দেয় না। যদি সে জমি দখল করিয়া বসে তাহা হইলে শুধু জমি তাহার নয়, জমির উপর অধিকারও তাহারই। এই হইল আত্মপরের অধিকার; অর্থাৎ ইহা আমার পক্ষে ভাল কাজেই ইহা আমার ন্যায্য অধিকার। (১৪১-৫০)

কম্যুনিস্টরা আমার ভোগ বরাদ্দ করবে আমার শ্রমের মাপে। আমি যেমন খাটব তেমন পাব। এতে আমি রাজী নই, কারণ আমার ক্ষমতা যোগ্যতা আমার শ্রমশীলতায় সীমাবদ্ধ নয়।

প্রুদঁ[৪] ভেবেছিলেন সম্পত্তিকে চৌর্য বলে তিনি খুব হেয় করেছেন। তিনি খেয়াল করেন নি যে সম্পত্তির সংগতি মেনে নিলেই তবে চুরি সম্ভব হয়। সম্পত্তি চৌর্য নয়। সম্পত্তি আছে তাই সম্পত্তি চুরি যায়। প্রুদঁ চান ব্যক্তিগত সম্পত্তি এক যৌথ সম্পত্তিতে মিলিয়ে দিয়ে প্রত্যেকে তার হিস্‌সা বুঝে নিক। তার চেয়ে তিনি বললে ভাল করতেন :

> 'অনেক জিনিস আছে যাহা ভোগ করিতেছে মাত্র জনকয়েক লোক এবং যাহা আমরা অন্যেরা এখন হইতে দাবি করিব। উহা লইয়া লওয়া যাক কারণ সম্পত্তি এই প্রকারেই পাইতে হয় এবং যে বিত্ত হইতে আমরা এখনও বঞ্চিত হইয়া আছি উহার মালিকরা উহা এই প্রকারেই লইয়াছে। কয়েকজনের অধিকারে থাকার চেয়ে আমাদের সকলের হাতে থাকিলে এই সম্পত্তি বেশী কাজে লাগিবে। সুতরাং সম্পত্তির চৌর্যের জন্য এস আমরা সকলে এক হই।' একথা না বলিয়া প্রুদঁ আমাদিগকে বুঝাইতে চান যে সমাজ প্রথম হইতে সকল সম্পত্তির আদি ও অবিসংবাদী অধিকারী আর তথাকথিত মালিকরা সমাজবিত্ত চুরি করিয়া বসিয়াছে।[৫] (৩৩০)

মালিক সম্পত্তি ভোগ করে আইনের কৃপায়। আইন সম্মতি দিলে তবে বিত্তাধিকার

[৫] স্টার্নার সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রুদঁর মত ঠিকমত উপস্থিত করেন নি। চতুরঙ্গ, বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩৩৬ দ্রষ্টব্য।

লাভ হয়। বস্তুত রাষ্ট্রই বিত্তের মালিক, অধিকারী শুধু ইজারাদার। রাষ্ট্র ভক্ত প্রজাকে জমি ইনাম দেয় আর ক্ষুব্ধ প্রজার জমি বাজেয়াপ্ত করে। আপতদৃষ্টিতে রাষ্ট্র সকলকে ধন অর্জনের সমান সুবিধা দেয় বটে, বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা, রাষ্ট্র নিরপেক্ষ দর্শক-মাত্র। কার্যত তা নয়। প্রতিযোগিতার জন্যে যে বাস্তব মালমশলা দরকার তা আমার নিজের যোগ্যতায় সংগ্রহ করবার সুযোগ নেই, রাষ্ট্রের থেকে ভিক্ষা করে তা নিতে হবে। আমি বড় কারবারি হতে চাই কিন্তু আমার মাল নেই যন্ত্র নেই। অমুক মালিকের কারখানা থেকে কেড়ে কিংবা চুরি করে নিলেই হয়। কিন্তু রাষ্ট্র তা দেবে না কারণ মালিক তার বর্গাদার। অমুক কলেজের প্রফেসরের চেয়ে আমার বুদ্ধি ও জ্ঞান বেশী, পড়াইও ভাল। কিন্তু কলেজে আমার জায়গা হবে না কারণ ডিগ্রী নেই।[৬] ডিগ্রী দেবে রাষ্ট্র—তার কাছে দরখাস্ত করে ডিগ্রী পেলে তবে আমার যোগ্যতা বিবেচিত হবে। মানুষে মানুষে সমানে সমানে প্রতিযোগিতায় একজন হারে একজন জেতে তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু এখানে তো মানুষের প্রতিযোগিতা নয়, প্রতিযোগিতা টাকার আর রাষ্ট্রদত্ত দাক্ষিণ্যের।

যারা সর্বহারা তাদের কিছু হারাবার নেই, তাই রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হবারও দরকার নেই। বরং মালিকদের অভয়দাতা রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে পারলে তাদের লাভ। রাষ্ট্রই মালিকদের আশ্রয় দিয়েছে আর প্রলিতারিয়দের বঞ্চিত করে রেখেছে। রাষ্ট্র অবশ্য জনসাধারণের, কিন্তু শ্রমিকসাধারণ টাকা ও জমির মালিকদের, অর্থাৎ পুঁজিপতিদের করায়ত্ত। 'শ্রমিক পরিশ্রম করে ক্রেতার জন্যে যে মাল পয়দা করে তার পুরো দাম সে পায় না' (১৫১)। পুঁজিপতি তাকে তার শ্রমমূল্যের চেয়ে কম মজুরি দেয়। কিন্তু সে অনুগত প্রজা, রাষ্ট্রের আশ্রিত, মোটা খাজনা দেয় তাই অবাধে তার শ্রমিক শোষণ চলে।

শ্রমিক যদি তার পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য চায় তাহলে রাষ্ট্র আসবে সালিশি করতে, তাকে ঠাণ্ডা করতে। সে যদি তার সালিশি না মানে এবং বেশী চেয়ে বসে তাহলে রাষ্ট্র 'সিংহের থাবা ও ঈগলের নখ' নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাজেই যা নেবার শ্রমিককে জোর করে নিতে হবে। ভালবাসা ও ত্যাগের কীর্তন তো হাজার হাজার বছর ধরে হল। তার ফল হয়েছে আজকের দৈন্যদশা। তবে কেন আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা?

> শ্রমিকদের হাতে আছে প্রচণ্ড ক্ষমতা। যদি তারা এ সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন হইয়া ইহাকে প্রয়োগ করিতে পারে তাহা হইলে কিছুতেই তাহাদিগকে রুখিতে পারিবে না। তাহারা শুধু কাজ বন্ধ করুক, উৎপন্ন দ্রব্য নিজেদের বলিয়া মনে করুক, ভোগ করুক...রাষ্ট্র স্থাপিত শ্রমিকের দাসত্বের উপর। শ্রমিক মুক্ত হউক, রাষ্ট্র উচ্ছন্ন যাইবে। (১৫২)

ব্যক্তিবাদী বিপ্লবী নয়। বর্তমান বিধান ভেঙে দিয়ে এক নূতন বিধান প্রবর্তন করা তার উদ্দেশ্য নয়। তার কোন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক লক্ষ্য নেই। সে বিদ্রোহী, নিজেকে সকলের ওপরে জাহির করবার জন্য তার বিদ্রোহ।

> শোনা যায় মানুষ নাকি ইতিহাস গড়ে,—জাতি, শ্রেণী সমাজ জনস্বার্থ ইত্যাদি নাকি ইতিহাসের সারথি। কিন্তু ইতিহাস দেশ ও জাতির যে পতনের কথা বলে সে কীর্তি কাদের? আপন খেয়াল চরিতার্থ করতে উন্মুখ অহঙ্কারীরা ছাড়া আর কারা? অহঙ্কারীর কাছে ত্যাগ নেই। তার আছে এক দুর্জয় কামনা, সকল সাধ-আহ্লাদ

[৬] স্টার্নার ছিলেন স্কুল মাস্টার, তাঁর প্রতিপক্ষ বাউয়ার ছিলেন অধ্যাপক।

তাতে ডুবে যায়। সে স্বার্থপর কিন্তু ইন্দ্রিয়বশ নয়।[৭] কারণ ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা বিলাস ব্যসনের বাইরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিলাসী আপনার ওপর অধিকার হারিয়ে ফেলে, সে কামাতুর। অহঙ্কারী আত্মপর ব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় আত্মস্থ। সে বিরাগীও নয়। জীবনের পাত্র কানায় কানায় ভরে তুলে সে আকণ্ঠ পান করে জীবনসুধা। মোমবাতি যেমন পুড়ে গেলেই সার্থক, জীবনও তেমনি ভোগে ব্যয় হলেই সার্থক।

> এখন হইতে প্রশ্ন ইহা নহে কেমন করিয়া জীবনকে পাওয়া যাইবে, প্রশ্ন হইল কেমন করিয়া জীবনকে খরচ করা যাইবে, ভোগ করা যাইবে। (৪২৭)

তৃণ ও পশুর যেমন কোন লক্ষ্য নেই, আদর্শ নেই তেমন আমিও লক্ষ্যহীন, আত্মপরায়ণ।

> ফুল ফুটিয়া উঠিবার ডাকে সাড়া দিয়া ফোটে না। সে সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া পৃথিবীকে ভোগ করে, গ্রহণ করে। সে যত পারে মাটির রস শুষিয়া লয়, শূন্য হইতে বাতাস টানিয়া লয়, সূর্যের আলো পান করিয়া লয়। পাখি কোন কর্তব্যের নির্দেশে চলে না। সেও যথাসাধ্য তাহার শক্তি প্রয়োগ করে, গুবরে পোকা ধরিয়া খায় আর প্রাণ ভরিয়া গান গায়। (৪৩৫)

আর মানুষের বেলা নিয়ম আলাদা। ফুল ও পাখির মত স্বাভাবিক হতে গেলে সে অহঙ্কারী, পাপিষ্ঠ, অমানুষ। মানুষকে ভগবান ভাবা আর পাপী ভাবা একই রকম বিকার। আমরা যা তাই—এর চেয়ে বড় হতে পারি না, বরং দরকারও নেই। ঈশ্বর মানবতা ইত্যাদি কল্পনা সামনে খাড়া করে মানুষকে তার পায় নোয়ানো হয় বলেই সে পাপী।

> লোককে পাপী বলিও না, তাহারা কখনও পাপী নয়। কেবল তুমিই পাপীর সৃষ্টিকর্তা, যে তুমি মানুষকে ভালবাস বলিয়া মনে কর আর মানুষকে পাপের কাদায় ছুঁড়িয়া ফেল, তাহাদিগকে সাধু অসাধু, মানুষ অমানুষে এই দুই ভাগে ভাগ কর, নিজের ভূতে পাওয়া দাসাবৃত্তি দিয়া তাহাদিগকে বশীভূত কর। কারণ তুমি তো মানুষকে ভালবাস না, ভালবাস মানবতাকে। কিন্তু আমি বলিয়া দিতেছি তুমি কখনো পাপী দেখ নাই, শুধু তাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছ। (৪৮১-৮২)

ঈশ্বর নাকি অনির্বচনীয়, অতুলনীয়, বিশুদ্ধ, একমেবাদ্বিতীয়ম্। ঈশ্বর নয়, আমিই তাই।

বড়ই ভয়ের কথা! তাহলে সব যে ভেঙে পড়বে। চারদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, যে যা খুশি তাই করবে! কে বলল যে যা খুশি তাই করতে পারবে? তুমি আছ কি করতে? আমার বদখেয়ালকে তুমি সহ্য করবে কেন? আত্মম্ভরি তোমাকে খাতির করবে না, কিন্তু তোমার গায়ের জোরকে খাতির করবে। অহং-এ অহং-এ ঠোকাঠুকি লাগবে একজন হার মানতে পারে কিন্তু বশ মানবে না।

> ওখানে আমি মানুষের সামনে মানুষের মত মুকাবিলা করি। এখানে আমি যেন একটি স্কুলের ছেলে, সহপাঠীর গায় হাত তুলিয়াছি আর সে তাহার বাপ-মাকে ডাকিয়া তাহাদের আড়ালে লুকাইয়াছে, আমি একটি অসভ্য বাঁদর বলিয়া বকুনি খাইতেছি, কথা বলিতে গেলে শুনিতেছি—'তর্ক করিও না'। (২৭৮)

[৭] ফল্‌কেনবার্গ "হিস্ট্রী অব মডার্ন ফিলসফি"তে মন্তব্য করেছেন স্টার্নার ছিলেন ইন্দ্রিয়বাদী।

অভিভাবকদের শাসন থেকে মুক্ত আত্মসর্বস্ব ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় মিলবে। বিত্তাধিকার পবিত্র অধিকার এ ধারণা দূর হলে সকলে বিত্ত লাভ করবে এবং ব্যক্তিসম্মিলন যার যার অধিকার মেনে নেবে। বিত্ত সমাজের বর্গা বলে গণ্য হবে না। ব্যক্তিকে লাঠি হাতে নিয়ে সম্পত্তি পাহারা দিতে হবে না।

এই স্বেচ্ছামিলনের সঙ্গে জাতীয় ঐক্যের প্রভেদ আছে। জাতীয় ঐক্য মৌমাছির ঐক্য, যেন সকল মাছি চোখ বুজে রানী মাছির পিছন পিছন উড়ছে। যেমন জার্মান জাতির ঐক্যাভিলাষ। একজন জার্মান আর একজন জার্মানকে দেখে ভাবে বিগলিত হয় এর চেয়ে হাস্যকর আর কি আছে?

সমাজ আবদ্ধ স্থাণু, স্বেচ্ছামিলন মুক্ত চলমান। এর যোগসূত্র চুক্তি যে চুক্তি সর্বদা সংশোধনসাপেক্ষ। চুক্তি স্থায়ী হয়ে গেলেই মিলন জমে গিয়ে হবে অচল সমাজ। অবশ্য চুক্তিতেও স্বাধীনতা খর্ব হয়। মিলনের উদ্দেশ্য স্বাধীনতা নয়। পূর্ণ স্বাধীনতা কে কবে পেয়েছে? আমি কি পাখির মত উড়তে পারি না মাছের মত ডুবসাঁতার কাটতে পারি? মিলনের উদ্দেশ্য আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া যা রাষ্ট্র ও সমাজে সম্ভব নয়।

> মিলন আমার নিজের গড়া জিনিস—আমার নমস্য নয়, আমার উপর ইহার কোন আত্মিক প্রভাব নাই, যেমন কোন প্রতিষ্ঠানেরই নাই। আমি যখন নিজের কথাকে দাসখত লিখিয়া দিতে রাজী নই, কথার নড়চড় হইবে না এরূপ আশ্বাস না দিয়া বরং অবিরাম নিজের কথার সমালোচনা করি, তখন আমার সারা ভবিষ্যত একটা মিলনচুক্তিতে গচ্ছিত রাখিব আমার আত্মাকে বন্ধক রাখিব এ আরো অসম্ভব।...আমি যেমন রাষ্ট্র চার্চ ঈশ্বর প্রভৃতি হইতে আমার নিকট অধিক মূল্যবান তেমন সম্মিলন হইতেও অনেক বেশী মূল্যবান। (৪১০)

লাওৎসের পর এমন সর্বান্তক বিদ্রোহের বাণী আর উচ্চারিত হয়নি। গডউইন ও প্রুদ'র পদ্মমধুর মৌতাতে পাঠক যখন ঝিমিয়ে পড়ে তখন স্টার্নারের চাবুক খেয়ে তার সুখস্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়, চোখ রগড়ে আবার খুলতে হয় পুরোনো পাঠ, যাচাই করতে হয় পরীক্ষিত সত্য, বদ্ধমূল বিশ্বাস। জীবনের ভিত্তি নড়ে যায়, সকল মূল্যবোধের মূলে টান পড়ে। তারপর যখন চারদিক ঘিরে আসে অতল অন্ধকার নাস্তিবাদ, তখন থেমে যায় কম্পন, মন আবার স্থির হয় জীবনবেদের অটল বনিয়াদের ওপর। স্টার্নারের মত শক্ত ওঝাও মাথার ভূত নামাতে পারে না।

এই পরম বিদ্রোহী নিশ্ছিদ্র মহাশূন্যের মাঝে অহং-এর বিন্দু পরিমাণ স্থিতিস্থাপনের ওপর দাঁড়িয়েছেন নিঃসঙ্গ একাকী। রাষ্ট্র গেল, ধর্ম গেল, চিন্তা ও যুক্তি গেল সমাজ ও ন্যায়বোধ গেল, গেল কর্তব্য, ভালমন্দর বিচার। 'আমি আমার সর্বস্ব স্থাপন করেছি নাস্তির ওপর'—আমার কাছে আমি ছাড়া সব মায়া। এই ধ্বংসাত্মক শূন্যবাদের ওয়ারিস হয়েছিল রুশ নিহিলিস্টরা।[৮] স্টার্নারের মত এদের শূন্যবাদও বৈপ্লবিক আশা-আকাঙ্ক্ষার বজ্রাঘাতে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

স্টার্নারের খড়্গাঘাত কোন দূষিত সমাজ ও নীতিশাস্ত্রের ওপর নয়, সকল রকম মৌথ

[৮] উনিশ শতকের তৃতীয় পাদের যুক্তিবাদী অবিশ্বাসীরা। পরবর্তী বিপ্লবীরা নয়, যদিও নিহিলিস্ট নামে তারাও পরিচিত।

সত্তা ও তার আনুষঙ্গিক দায়িত্বের ওপর। তাঁর ধারণা ব্যক্তি আত্মস্থ হলে নীতিশাস্ত্র ও দায়িত্ববোধ লোপ পাবে, সমাজ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্বন্ধে এ ধারণা ঠিক, মন থেকে দূর করে দিলেই এদের অবসান। কিন্তু সমাজের বেলা নয়। জলবায়ু মাটি আকাশ যেমন ব্যক্তিনিরপেক্ষ বাস্তব সত্য, সমাজ পরিবেশও তাই, একে চাই না বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সমাজের চেহারা বদলায়, সমাজ যায় না। সমাজ ও সমাজধর্মকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির সুখসম্পত্তি দূরে থাক, তার জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে ওঠে। যদি সমাজ হয় ভৌতিক মায়া তবে আত্মসর্বস্ব ব্যক্তি ততোধিক মায়া। হেগেলের নির্বিকল্প চিৎসত্তার মত স্টার্নারের অদ্বৈত পরমাহংকারও এক শূন্যসঞ্চারী ন্যায়ের তত্ত্ব। বাস্তব জগতে এমন সমাজবিরহিত আত্মকেন্দ্রিক মানুষ কোথায়?

স্টার্নার সমাজের বিকল্পে অবতারণা করেছেন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে চুক্তির মিলন। সতত যুধ্যমান আত্মম্ভরিদের সংঘাতে এ মিলন টিকতে পারে না। স্টার্নার চানও না যে মিলন স্থায়ী হোক। কারণ হলেই তা অচল সমাজে পর্যবসিত হবে। তাঁর মিলনচুক্তি অবিরাম পরিবর্তমান, বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে বুদ্‌বুদের মত তাদের স্থিতি ও বিলয়। সুতরাং 'সকলের বিরুদ্ধে সকলের যুদ্ধ' এই আরণ্য রীতিই সেখানে চিরন্তনী। ক্ষণিক মিলন হয় সংঘর্ষে নির্মজ্জিত।

তা বলে স্টার্নার কি স্বার্থ ও সম্ভোগের বৈতালিক? তা বললে সুবিচার হবে না। তাঁর অহংকার প্রধানত একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্য। সে হল এই যে যাবতীয় কর্মের উৎস অহং, ব্যক্তির মন যা চায় বাইরের বাধা না এলে সে তাই করে। আবার এ মন্তব্যও ঠিক নিরপেক্ষ নয় যে স্টার্নারের অহংকার কেবল চিন্তায় আত্মসচেতনতা ও কাজে আত্মনির্ভরতা এবং 'স্টার্নারের ব্যক্তি গণতান্ত্রিক চরিত্রের।'[৯] তার ওপর কারও কোন দাবি নেই। সে অন্যের স্বার্থ দেখে না, অন্যের অধিকার মানে না। তার সহিংস গ্রাসবৃত্তিকে আত্মনির্ভরতার আকাঙ্ক্ষা বললে অল্পোক্তি হয়। স্বাভাবিক মানুষের বেলা এটা মনস্তাত্ত্বিক সত্যও নয়। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে সাধারণ ভাবনাচিন্তার গড্ডালিকা থেকে স্বতন্ত্র হলে তবে ব্যক্তির মনের বিকাশ ঘটে,—ব্যক্তিমেই ব্যক্তিত্ব, সাধারণে সার্বজনীনতায় নয়। কিন্তু এখানেও দেখি ব্যক্তি এক ভাবপ্রভাব থেকে মুক্ত হতে না হতে আর একটি আদর্শে আশ্রয় নেয়; এক জীবনসূত্র ছিন্ন করে আর এক সূত্রে বাঁধা পড়ে—সে কখনো ত্রিশঙ্কুর মত মহাশূন্যে ঝুলতে পারে না। স্টার্নারের ব্যক্তিত্ব এক অসম্ভব কল্পনা।

স্টার্নার মধ্য উনিশ শতকের কালাপাহাড়। তাঁর নাশাত্মক দর্শনে গুরুদ্রোহী বাম হেগেলীয়রাও উচকিত হল। এর তীব্র ঝলকের কাছে গডউইন ও প্রুদ'র নৈরাজ্যবাদ হল নিষ্প্রভ, স্তিমিত। এঁরাও ব্যক্তিবাদী—কিন্তু এঁদের ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে সমাজের কেন্দ্রে। গডউইনের ব্যক্তি অপরের কল্যাণে সার্থক, প্রুদ'র ব্যক্তি অপরের সঙ্গে সহযোগে সম্পূর্ণ। স্টার্নারের বিধানে জাস্টিস ও মাতুয়ালিতের জায়গা নেই, বিত্তের বিভাগ শ্রমের সংগঠন ইত্যাদি অবান্তর প্রশ্ন। সৌভাগ্যের কথা স্টার্নার ছিলেন তার্কিক, প্রুদ'র মত তিনি তাঁর তর্ক নিয়ে কার্যক্ষেত্রে নামেন নি। তিনি কোন গোষ্ঠী তৈরি করেন নি, একজন শিষ্যও নয়। জার্মানীতে মোসেস হেস, কার্ল গ্রুন ও ভিল্‌হেল্‌ম্ মার-এর মারফত যেটুকু অরাজকী চিন্তা প্রচলিত হল তা স্টার্নারের দান নয়, প্রুদ'র কাছ থেকে পাওয়া।

[৯] ম্যাক্স্ এড্‌লার : এনসাইক্লোপীডিয়া অব সোস্যাল সায়েন্সেস, 'স্টার্নার, ম্যাক্স্'।

যে ভাববাদী দর্শনের পরাকাষ্ঠা হয়েছিল হেগেলের চিন্তায় তার দিন তখন ফুরিয়ে এসেছে। জার্মানদের বুকে যে জীবনসম্ভাবনার প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছিল দ্বন্দ্বমুখর প্রজ্ঞানবাদ নিদারুণ হতাশায় তার পরিসমাপ্তি ঘটছিল। চল্লিশোত্তর দশকে দেশ শত শত রাজ্যে বিভক্ত হয়ে আছে। যে উত্তাল জাতীয়তার তরঙ্গে নেপোলিয়ন ভেসে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় ঐক্যে তা সার্থক হল না। জনতা ভরসা করেছিল জার্মান রাজন্যদের নেতৃত্বে তাদের স্বাধীনতা ও একতার স্বপ্ন সফল হবে। রাজন্যদের কাছ থেকে সে নেতৃত্ব এল না। এই রাজনৈতিক নিরাশার মধ্যে দার্শনিকরা ভাব ও বস্তুর স্বরূপ নিয়ে আত্মহারা হয়ে আছেন। এরই প্রতিক্রিয়া স্টার্নারের লক্ষ্যহীন শূন্যবাদ।

কিন্তু জার্মান মনীষার অপমৃত্যু হয় নি। অসার ভাববিলাসের আবর্ত থেকে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজছিলেন স্ট্রাউস, ফয়েরব্যাক, হেস—এঁরা দিলেন নূতন সমাজ-ব্যাখান, সৃষ্টি করলেন নূতন সমাজমূল্য, জ্বাললেন আশার বাতি।

স্টার্নারের নাম আজ বিস্মৃতির তলে ডুবে গেছে। কয়জন জানে যে লোকটি পৃথিবীকে তুড়ি মেরে জীবনের রসসুধা ওষ্ঠ ভরে পান করতে চেয়েছিল তাঁকে আকণ্ঠ পান করতে হয়েছিল জীবনের বিষ, স্বেচ্ছায় অকালমৃত্যু হয়েছিল তাঁর পরিণাম।[১০] এর চেয়ে দুঃখের কথা তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি হল না। এই ভাগ্যহত বিশ্বনিন্দুকের ক্ষুরধার সমালোচনা নৈরাজ্যবাদী চিন্তায় কি অবদান রেখে গেছে তার পুনর্বিচারের প্রয়োজন আছে। কত ছলনাময়ী মিথ্যার ছদ্মবেশ তিনি খুলে দিয়েছেন লজ্জা হলেও তা স্বীকার না করে উপায় নেই। যথা : নিঃস্বার্থ প্রেম, স্বর্গীয় ভালবাসা। ভালবাসা যদি স্বর্গীয় তাহলে আমি কুক্কুটমাংস ভালবাসি কোন প্রবৃত্তিতে? যখন আমি মানুষকে ভালবাসি তখন আমার ভালবাসা নিঃস্বার্থ। যখন কুক্কুট ভালবাসি তখন সে ভালবাসা স্বার্থপর। ভাষা যদি ভাবের প্রকাশ হয় তাহলে এক শব্দ দুই বিপরীত ভাবের বাহন হতে পারে না। কুক্কুটপ্রেম ও মানবপ্রেম সমান না হলেও সমগোত্রীয়।

স্টার্নারের সমালোচনার গুটিকয়েক ইতিবাচক দিকও আছে। বুদ্ধি ও ভালবাসায় আপীল করে সমাজকে যে গড়া যায় না, সমাজের ভেতরে যে আছে আপোসহীন স্বার্থের লড়াই, মুক্তি যে বলহীনের লভ্য নয়—এসব কথা তাঁর মত করে চোখে আঙুল দিয়ে আগে কেউ দেখায় নি। সম্পত্তির অধিকার তিনি মানলেন বটে কিন্তু একে বলের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এর জাত মেরে দিলেন, এর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেল। দরিদ্রদের পরের মুখের দিকে না তাকিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, জোর করে তাদের পাওনা কেড়ে নিতে হবে—এইখান থেকে বাজল শ্রেণীসংগ্রামের রণতূর্য, রচিত হল কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর ভূমিকা। মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্‌ স্বীকার করেছেন স্টার্নারের নাশকতা তাঁদের জন্যে জমি পরিষ্কার করে দিয়েছে। ধনিকের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শ্রমিক-অভ্যুত্থান, সভ্য সমাজের ভাবালুতার বিরুদ্ধে বাস্তব ইতরচেতনার আত্মঘোষণা, আগামী যুগে যার পরিণতি হল কম্যুনিস্ট ও সিন্ডিক্যালিস্টদের মাধ্যমে, স্টার্নারের আত্মনির্ভর ব্যক্তি তার এক বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসী পূর্বাভাস।

---

১০ চিররুগ্ন হতস্বাস্থ্য নীট্‌শে তাঁর দর্শনে প্রচার করেছিলেন যুদ্ধং দেহি মন্ত্র, আর চিরদরিদ্র স্কুল মাস্টার স্টার্নার করেছিলেন ভোগের ও অহঙ্কারের গুণগান। তর্কযুক্তির পিছনে দার্শনিকের দমিত বাসনা অলক্ষিতে কতখানি প্রভাব ছড়ায় তা অনুসন্ধান-সাপেক্ষ।

ল্যাটিন কবিতা অনুবাদ

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

dies amoris

মূল কবিতা থেকে অনুবাদ আর মূল কবিতা লেখা কবিকর্ম হিসাবে একই। মূল কবিতা লেখবার সময় আমরা দেখি, অনুবাদের সময় পড়ি। পড়াটাও এক ধরনের দেখা, অনুবাদক নিজে না দেখে মূল রচয়িতার চোখ দিয়ে দেখেন। বাস্তবিক পক্ষে অনুবাদক মূল রচয়িতার দৃষ্টির সঙ্গে নিজেরও দৃষ্টি মেলান। মেলাতেই হয় কারণ যে ভাষায় অনুবাদক কবিতার রূপান্তর ঘটাচ্ছেন সেই ভাষাই এই শুভদৃষ্টির ঘটক। কাজেই অনুবাদের প্রধান সমস্যা যথাযথ হয়েছে কিনা তা নয়, বস্তুত যথাযথ কথাটি এ ক্ষেত্রে দৃষ্টিভ্রম মাত্র, অনুবাদ যথাযথ হয় না, আক্ষরিক অনুবাদও যথাযথ নয়। আসল সমস্যা মূল কবিতার সাদৃশ্যভাব দেখা যাচ্ছে কিনা। সাদৃশ্যভাব দেখা গেলেই আমরা দেখব অনুবাদটিও কাব্যমণ্ডিত। ব্যাপারটি মনস্তত্ত্বের অন্তর্গত। এবং কি মনোভাব নিয়ে অনুবাদক অনুবাদ করবেন তা সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গী অনুবাদকের নিজের ব্যক্তিত্ব ও উপলব্ধির ওপর অনেকখানি নির্ভর করবে। সেইজন্য একই সময়ে একই কবিতা বিভিন্ন লোকের অনুবাদ আলাদা হতে পারে, তেমনি বিভিন্ন সময়ে একই কবিতার অনুবাদ আলাদা হতে বাধ্য। অনুবাদের মধ্যে আমরা কি দেখতে চাই? মূল কবিতার ব্যাখ্যা? না অনুবাদের কাব্যমণ্ডিত রূপটি? অবশ্যই এমন ব্যাখ্যা যা কাব্যমণ্ডিত হয়েছে। সার্থক অনুবাদের মধ্যে নিছক ব্যাখ্যা বা নিছক কাব্যময়তা থাকে না। ব্যাখ্যা করতে গেলেই কাব্যময় হবে, কাব্যময় হলেই ব্যাখ্যার এলাকায় এসে পড়বে।

একটি ভাষার প্রতিশব্দ অন্য ভাষায় না থাকার জন্যেই ব্যাখ্যা প্রয়োজন তা নয়। প্রতিশব্দ থাকলেও ব্যাখ্যার প্রয়োজন সব সময়ই থাকবে, অন্তত সার্থক অনুবাদের জন্য। অনুবাদের মধ্যে মূল কবিতার সব কিছুই ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়—ধ্বনি, কথা, রূপ, প্রতীক, ভাবানুষঙ্গ, সংবেদন ইত্যাদি। তবে কি অনুবাদক মূল কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে একটি স্বতন্ত্র কবিতা রচনা করেন? তা নয়। তিনি মূল কবিতার প্রক্রিয়াকে ধরবার চেষ্টা করেন। এই প্রক্রিয়াকে ধরতে গিয়ে অনুবাদককে হাজারো রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পাঠকমাত্রেই তার কিছুটা অন্তত অনুমান করতে পারেন। আমরা পরে যে সব দৃষ্টান্ত দেখাব তা থেকে এইসব সমস্যাগুলির রূপ কিছুটা বিশ্লেষণের মধ্যে ধরা যাবে আশা করি।

অতএব ব্যাখ্যাও একটি প্রক্রিয়া যেটি মূল কবিতাটির প্রক্রিয়াকে ধরবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া তথা ব্যাখ্যা স্থান কাল পাত্র হিসাবে আলাদা হতে পারে বা তার পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। প্রচলিত ভাবে হোমরের অনুবাদক Pope ও Chapman-এর কথা এই সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। Ezra Pound বর্ণিত Hughes Salel-এর হোমর অনুবাদ মাহাত্ম্যও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

ut silvae foliis pronos mutantur in annos,
prima cadunt ita verborum vetus interit aetas,
et iuvenum ritu florent modo nata vigentque

Ars Poetica—60-62

Horace থেকেই একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারে : *Ars Poetica*-র প্রথমেই রয়েছে :

Humano capiti cervicem pictoor equinam
iungere si velit, et varias inducere plumas
undique collatis membris, ut turpiter atrum
desinat in piscem mulier formosa superne
spectatum admissi risum teneatis, amici?

এর আক্ষরিক অনুবাদ ইংরেজি গদ্যে :

Suppose a painter wished to couple a horse's neck with a man's head, and to lay feathers of every hue on limbs gathered here and there, so that a woman, lovely above, foully ended in an ugly fish below ; would you restrain your laughter ; my friends, if admitted to a private view?

প্রথম ইংরেজি অনুবাদ পদ্যে :

A paynter if he shoulde adioyne
unto a womans heade
a long maires necke and overpread
the corpse in everye steade
with sondry feathers of strange huie,
the whole proportioned so
without all good congruitye
the nether parts do goe
Into a fishe, on hye a freshe
welfavord womans face:
My friends let in to see this sighte
could you not laugh a peace?

—T. Brant, 1566

Ben Jonson-এর অনুবাদ :

If to a womans head, a painter would
A horse neck joyn, & sundry plumes ore-fold
On every limb, ta'ne from a several creature,
Presenting upwards a fair female feature,
Which in a blacke foule fish uncomely ends:
Admitted to the sight, although his friends,
Could you contain your laughter?*

* প্রসঙ্গত চসরের এই তিনটি লাইন তুলে দিচ্ছি :

For if a peyntour wolde peynte a pyk
with asses feet, and hede it as an ape,
It cordeth nought: so were it but a jape

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে গদ্য অনুবাদে, Ben Jonson বা T. Brant-এর পদ্য অনুবাদে humano capiti বাদ পড়ে গেছে। Dryden-এর বন্ধু Christopher Smart-এর অনুবাদে human কথাটি ঠিক রয়েছে।

স্থান কাল পাত্রের চিহ্ন কিভাবে থাকতে পারে তা দেখাবার জন্যেই এই দৃষ্টান্তটি নিয়েছি। আমার মনে হয় Brant-এর অনুবাদটি অনেক বেশি ইংরেজি, Ben Jonson অনেক বেশি ল্যাটিন ঘেঁষা। Ben Jonson প্রখ্যাত বড় কবি নাট্যকার হলেও Brant-এর অনুবাদে কবিত্বও বেশি। বলা বাহুল্য ব্যাখ্যা বলতে যা বোঝায় তা Brant-এর অনুবাদেই আছে, যদিও তৎকালীন মেজাজের জন্যই কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছেন, যাতে অনুবাদের মাধ্যমে নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারেন। এ ধরনের এই দৃষ্টান্ত থেকে পাঠকের হঠাৎ মনে হতে পারে যে Horace বুঝি অনুবাদকের সম্বন্ধে ওই লাইনকটি লিখেছেন, যেন অনুবাদকেরা উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে থাকেন—সেইজন্যেই। আসলে Ovid এর কবিতা সম্পর্কেই তাঁর এই শ্লেষোক্তি, বর্ণনাটির মালমশলাও কিছু কিছু Ovid থেকে নেওয়া, তাঁরই কথা নিয়ে তাঁকে ঠাট্টা করা।* সে যাই হোক মনে হয় humano কথাটি human অর্থেই (পুরুষ বা নারী সম্বন্ধে অনির্দিষ্ট), এই কথাটি দিয়ে আরম্ভ করলে পরে যে উদ্ভট ছবিটি তৈরী হচ্ছে তা বোঝাতে সুবিধে হয়।

মিলটন যতগুলি কবিতা অনুবাদ করেছেন তার মধ্যে Horace-এর এই ওড্‌টির অনুবাদ বিখ্যাত :

What slender youth, bedew'd with liquid odours,
Courts thee on Roses in some pleasant Cave,

এবং শ্লেষে :

Troilus and Criseyde

Cf. Phaedrus. every speech should be put together like a living creature, with a body of its own, lacking neither head nor foot . . . .'

* Ovid-*Metamorphosis* Bk. V . . . . Vobis, Acheloides, unde
pluma ptdesque avium, cum virginis ora geratis?
an quia, cum legeret vernos Proserpina flores,
in comitum numero, doctae sirenes, eratis?
quam postquam toto frustra quuesistis in orbe,
protinus, ut vestrum sentirent aequora curam,
posse super fluctus alarum insistere remis
optastis facilesque deos habuistis et artus
vidistis vestros subitis flavescere pennis,
ne tamen ille canor mulcendas natus ad aures
tantaque dos oris linguae deperderet usum,
virgine vultus et vox humana remansit. V. 552/63

Golding অনুবাদ... Why you *Acheloes* daughters weare
Both feete and feathers like to Birdes, considering that you beare
The upper partes of Maidens still? and commes it so to passe,
Bicause when Ladie *Proserpina* a gathering flowers was,
ye Meremaides kept hir companie, whom after you had sought
Might also to the Seas be knowen, ye wished that ye might
Upon the waves with hovering wings at pleasure rule your flight,
And had to Godde to your requesr so plaint, that ye found
With yellow feathers out of hand your bodies clothed round.... ইত্যাদি

Pyrrha For whom bind'st thou
In wreaths thy golden Hair,
Plain in thy neatness, O how oft shall he
On faith and changed Gods complain, and Seas
Rough with black winds, and storms
Unwonted shall admire:
Who now enjoys thee credulous, all Gold,
Who always vacant always amiable
Hopes thee, of flattering gales
Unmindfull. Hapless they
To whom thou untry'd seem'st fair. Me in my vow'd
Picture the sacred wall declares t'have hung
My dank and dropping weeds
To the stern God of Sea

Quis multa gracilis te puer in rosa
Perfusus liquidis urget odoribus,
Grato, Pyrrha, sub antro?
Cui flavam religas comam
Simplex munditie? heu quoties fidem
Mutatosque does flebit, et aspera
Nigris aequora ventis
Emirabitur insolens,
Qui nunc te fruitur credulas aurea:
Qui semper vacuam, semper amabilem
Sperat, nescius aurae
Fallacis, miseri quibus
Intentata nites me tabula sacer
Voltiva paries indicat uvida
Suspendisse potenti
Vestimenta maris Deo.

রোমের courtesan Pyrrha, Horace তাঁর পরম ভক্ত হলেও তাঁর প্রেমকে দেখতেন সমুদ্রের মতো যুগপৎ মধুর এবং ভয়ঙ্কর। সম্প্রতি Horace-এর নৌকাডুবি হয়েছিল, কিন্তু প্রাণে মারা যাননি, বেঁচে গিয়ে নেপচুনের মন্দিরের গায়ে ঝুলিয়েছিলেন ভরাডুবির স্মৃতি-চিহ্নগুলি। মূল metaphorটি heu quoties fidem থেকে nescius aurae fallacis পর্যন্ত। কবিতাটি অনুবাদ সম্বন্ধে মিলটন নিজেই বলেছেন— Rendered almost word for word without Rhyme according to the Latin Measure, as near as the Language will permit.

কেন এই অনুবাদটি এত খ্যাতি লাভ করেছে? ভালোরি মনে করতেন যে 'বিশুদ্ধ কাব্য' একমাত্র অনুবাদেই সম্ভব। বৈজ্ঞানিকের কাছে 'বিশুদ্ধ জল' বলতে যা বোঝায়, ভালেরির কাছে 'বিশুদ্ধ কাব্য' ছিল অনেকটা তাই। অর্থাৎ অনুবাদেই কবি শুদ্ধ হতে পারেন, সেখানে তাঁর নিজের চৈতন্যের আবিলতা আসে না, তাঁর একমাত্র কর্ম একটি কাব্যরূপকে রূপান্তর করা। চিত্ত শুদ্ধ না হলে একাজ সম্ভব নয়। আর এ কাজে চিত্তের আবিলতা আসারও কোনো সুযোগ নেই, অন্তত সৎ অনুবাদকের কাছে। মিলটনের এই অনুবাদটি সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে মিলটনের diction এখানে আলাদা মূল কবিতার প্রতি আত্মীয়তা তিনি যেমন রাখতে চেয়েছেন, তেমনি চেয়েছেন একটা ব্যবধান। আত্মীয়তা আছে বলেই অনুবাদটি কাব্যমণ্ডিত হয়েছে। অপরপক্ষে ব্যবধান আছে বলেই পাঠকের মন অনায়াসে (বরং নিজের মনের অগোচরেই) মূল কবিতাটি হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে। আমার নিজের বিশ্বাস যে অনুবাদের ভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষা, সে ভাষাতে মৌল ভাব প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু মূল কবিতার রূপান্তর সম্ভব, অন্ততঃ বহুলাংশে।

... heu quoties fidem mutatosque deos flebit-এর চমৎকার অনুবাদ—
O how oft shall he on faith and changed gods complain.

মিলটনের অনুবাদে যে কবিত্বশক্তি দেখা গেছে, অতখানি না হলেও হরেসের এই অনুবাদটি ভালই।

Mecenas, sprung from Tuscan Kings, for thee
Mild wine in vessels never toucht I keep,
Here roses and sweet odours be
Whose dew thy hair shall steep
O stay not, let moist Tibur be disdained
And Aesulaes declining fields and hills
Where once Telegonus remained
Whose hand his father kills
Forsake that height where lothsome plenty cloys
And towers which to the lofty clouds aspire,
The smoke of Rome, her wealth and noise,
Thou wilt not here admire
* * * *
The wise Creator from our knowledge hides
The end of future times in darksome night,
False thoughts of mortals he derides
When them vain toys affright
With mindful temper present hours compose,
The rest are like a river, which with ease
Sometimes within his channels flows
Into Etmurian seas,

Oft stones, trees, flocks and houses it devours
With echos from the hills and neighbouring woods
When some fierce deluge, rais'd by showers,
Turns quiet brooks to floods
He master of himself in mirth may live
Who saith, I rest well pleased with former days
Let God from heaven to-morrow give
Black clouds or sunny rays,
No force can make that void which once is past
Those things are never altered or undone
Which from the instant rolling fast
With flying moments run.

—Sir John Beaumont

Tyrrhena regum progenies, tibi
non ante verso lene merum cado
cum flore, Maecenas, rosarum et
pressa tuis balanus capillis
iamdudum apud me est eripe te morae,
nec semper undum Tibur et Aefulae
declive contempleris arvum et
Telegoni iuga parricidae
fastidiosam desere copiam et
molem propinquam nubibus arduis,
Omitte mirari beatae
fumum et opes strepitumque romae

* * * *

Prudens futuri temporis exitum
Caliginosa nocte premit deus,
ridetque si mortalis ultra
fas trepidat, quod adest momento
componere acquus ; cetera fluminis
ritu feruntur, nunc medio alveo
cum pace delalentis Etruscum
in mare, nunc lapides adesos
stirpesque raptas et pecus et demos
volventis una non sine montium
clamore vicinaeque silvae
cum fera dilivies quietos

irritat amnis ille potem sui
laetusque deget, cui licet in diem
dixisse 'vixi. cras vel atra
nube polum Pater occupato
vel sole puro ; non tamen irritum,
quodcumque retro est, efficiet neque
diffinget infectunque reddet,
quod fugiens semel hora vexit'.

মিলটনের মতো আক্ষরিক অথচ নিখুঁত অনুবাদ এটি নয়। Beaumont স্বাধীনতাও নিয়েছেন, সম্ভবত ছন্দ বজায় রাখবার জন্যেই। যেমন, একটি অন্যতম বাড়তি লাইন—Thou wilt not here admire। তবু বন্ধু প্রেমের একটা ভাব আসে এই অনুবাদটিতে।

অনুবাদ প্রসঙ্গে অবলম্বনের কথা আসে। দুটির মধ্যে পার্থক্য আকাশ পাতালের চেয়েও বেশি। অনুবাদে মূল কবিতার প্রক্রিয়া ধরা পড়ে, অবলম্বনে লেখা কবিতা একটি স্বতন্ত্র কবিতা, কবি সেখানে অপরের ভাব আত্মসাৎ করেন, এবং আমাদের প্রায় কোনো সুযোগই থাকে না মূল কবিতাটির সম্বন্ধে আগ্রহ জাগবার। একটি দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারে।

পাঠক মাত্রই জানেন যে *Tempest* নাটকে Prospero-র উক্তি—Ye elves of hills, brooks, standing lakes, and groves ইত্যাদি Golding-এর Ovid-কৃত *Metamorphosis*-এর অনুবাদ— Ye Elves of Hills, of Brooks, of Woods above ইত্যাদি থেকে নেওয়া। তিনজনের—অর্থাৎ Ovid, Golding এবং Shakespeare, পুরো উদ্ধৃতি দিয়ে বিচার করা যেতে পারে।

Ovid:

... montesque amnesque lacusque
dique omnes nemorum, dique omnes noctis adeste,
quorum ope, cum volui, ripis mirantibus amnes
in fontes rediere suos, concussaque sisto,
stantia concutio cantu freta, nubila pello
nubilaque induco, ventos aligoque vocoque
vipereas rumpo verbis et carmine fances,
vivaque saxa sua convulsasque robora terra
et silvas moveo jubeoque tremescere montis
et mugire manesque exire sepulcris!

Shakespeare:

Ye elves of hills, brooks, standing lakes, and groves,
And ye that on the sands with printles foot
Do chase the ebbing Neptune, and do fly him
And 'twixt the green sea and the azur'd vault

By moonshine do the green sour ringlets make,
Where of the ewe not bites, and whose pasttime
Is to make midnight mushrooms, that rejoice
To hear the solemn curfew ; by whose aid,
Weak masters though ye be, I have bedimm'd
The noontide sun, call'd forth the mutinous winds,
And 'twixt the green sea and the azur'd vault
Set roaring war, to the dread rattling thunder
Have I given fire, and rifted Jove's stout oak
With his own bolt ; the strong-bas'd promontory
Have I made shake, and by the spurs pluck'd up
The pine and ceder ; graves at my command
Have wak'd their sleepers, op'd, and let 'em forth
By my so potent art.

—*Tempest*

Metamorphosis-এর অনুবাদ হিসেবে Shakespeare-এর উপরোক্ত লাইনগুলি কোনো কোনো anthology-তে দেখেছি। বলা বাহুল্য এই লাইনগুলি Ovid-Golding অবলম্বনে লেখা Shakespeare-এর নিজস্ব অসামান্য কবিতা। এ কাজ চিরকালই কবিরা করে আসছেন। কখনো কখনো কবিরা অপরের কাব্যিক মুহূর্তকে নিজের কবিতার চৌহদ্দির মধ্যে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন। এই মাত্র। যেমন বোদলেঅরের Maint joyeu dort euseveli Gray-র অবলম্বনে লেখা। কিন্তু অবলম্বনে লেখা কবিতা, আর কবিতা অনুবাদ চিরকালই আলাদা। এবং এ থেকে বোঝা যায় যে অনুবাদ সাহিত্যের একটি নিজস্ব সত্তা আছে। অনুবাদ নন্দনতত্ত্বও নতুনভাবে বিচার করা উচিত।

Ovid-এর *Metamorphosis* বহু লোকে অনুবাদ করেছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনকে বেছে নিচ্ছি—একজন হচ্ছেন Golding, অপরজন Sandys. Prosperpine হরণের কাহিনী থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

Golding:
Ye Eleves of Hills, of Brooks, of Woods alone,
Of standing Lakes, and of the Night approach ye everychone
Through help of whom (the crooked bankes much wondering at the thing)
I have compelled streams to run cleane backward to their spring.
By charmes I make the clame seas rough, and make c/y rough seas plaine
And cover all the skie with clouds, and chase them thence againe.
By charmes I rayse and lay the windes, and burst the vipers jaw,
And from the bowels of the Earth both stones and trees doe drawe.
Whole Woods and Forestes I remove: I make the Mountaines shake,
And even the Earth it selfe to grone and fearfully to quake
I call up dead men from their graves . . .

Ovid: *Metamorphosis*: 7, 265-275.

See Ovid. Book 7-197.

Neare *Enna* walles there stands a Lake Pergusa is the name
Cayster heareth not mo songs of swannes then doth the same.
A wood environs every side the water round about,
And with his leaues as with a veyle doth keepe the sunne heate out.
The boughs doe yeelde a coole fresh ayre ; the moysture
of the ground
Yeeldes sundrie flowers ; continuall spring is all the yeare there
there found.
While in this Garden *Proserpine* was taking hir pasttime,
In gathering eyther Violets blew, or Lillies white as Lime,
And while of Maidenly desire she filled hir Maund and Lap,
Endeauoring to outgather hir companions there. By Lap
Dis spide her ; loude hir: caught hir up: and all at one well here.
So hastie, hote, and swift a thing is Loue, as may appere.
The Ladie with a waiting voyee afright did often call
Hir Mother and hir waiting Maides, but Mother most of all.
And as she from the upper part hir garment would have rent.
And as she from the upper part hir garment would have rent,
And such a sillie simplenesse hir childish age yet beares,
That euen the verie loss of them did move him more to teares.
The Catcher drives his chariot forth, and calling every horse
By name, to make away apace he doth them still enforce:
And shakes about their neckes and Maynes their rustie bridle reynes.
And through the deepest of the Lake perforce he them constreynes
And through the *Palie* pooles the which from ground doe boyle
And smell of Brimstone verie ranke: and also by the soyle
Where as the Bachies folke of *Corinth* with the double seas,
Betweene unequal Havons twaine did reere a town for ease.

—Golding, Arthur, 1567

Not far remou'd from *Enna's* high-built wall,
A Lake there is, which men *pergusa* call.
Cayster's flowly-gliding waters beare
Far fewer signing swam them are heard there.
Woods crown the Lake, and clothe it round about
With leauy veils, which phoebus beams keep-out
The trees create fresh ayr, th' Earth various flowers:
Where heat nor cold th' eternall spring deuoures.
Whilst in this grove *Proserpina* disports,

Or Violetes pulls, or Lillyes of all sorts ;
And while she stroue with childish care and speed
To fill her lap, and others to exceed ;
Dis saw, affected, carryed her away,
Almost at once. Loue could not brooke delay
The sad-fac't Goddesse cryes (with feare appall'd)
To her Companions, oft her mother call'd
And as she tore th' adornment of her haire,
Down fell the flow'rs which in her lap she bare
And such was her sweet youth's simplicitie,
That their loss also also made the virgin crie,
The Rauisher flies on swift wheels, his horses
Excites by name, and their full speed inforces:
Shaking for haste the rust-obscured raignes
Upon their cole-black necks, and shaggy maines
Through Lakes, through *Palicine,* which expires
A sulphrous breath, through earth ingendringfires,
They passe to where, *Corinthian Bacchides*
Their Citie built betweene unequal seas.

—George Sundys, 1626

Ovid:

Hand procul Hennaeis lacus est a moenibus altae
nomine pergus, aquae, non illo plura caystros
carmina cychorum labentibus audit in undis.
silva coronat aquas cingens latus omne suisque
frondibus ut velo phoebeos submovet ictus ;
frigora dant rami, tyrios humus umida flores:
perpetuum ver est, quo dum proserpina luco
ludit et aut violas aut candida lilia carpit,
dumque puellari studio calathosque sinumque
inplet et acquales certat superare legendo,
paene simul visa est dilectaque raptaque Diti:
usque adeo est properatus amor, dea territa maesto
et matrem et comites, sed matrem saepius, ore
clamat, et ut summa vestem laniarat ab ora,
collecti flores tunicis cecidere remissis,
tantaque simplicitas puerilibus adfuit annis,
haec quoque virgineum movit iactura dolerem.

raptor agit currus et nomine quemque vocando
exhortatur equos, quorum per colla inbasque
excutit obscura tinctas ferrugine habenas,
perque lacus altos et olentia sulphure fertur
stagna Palicorum rupta ferventia terra
et qua Bacchiadae, bimari gens orta Corintho,
inter inaequales posuerunt moenia portus.

Golding ও Sandys উভয়েই চেয়েছেন Ovid-এর কাছাকাছি থাকতে। যেমন সব অনুবাদকই চান। কিন্তু Sandys যেখানে কেবলমাত্র কথায় আত্মীয়তা করতে চেয়েছেন, সেখানে Golding অনেকখানি আত্মনিবেদন করতে পেরেছেন।

অংশটির প্রথমেই Pergus নামক হ্রদের উল্লেখ, ঠিক তারপরেই প্রথম কাব্যরসের সূচনা—nou illo plura Caystros... ইত্যাদি। এখানে এসেই দুজনেই দুটি কথা labentibus ও undis নিয়ে মুশকিলে পড়লেন। Sandys অনুবাদ করলেন :

Caystros flowing-gliding waters beare
Far fewer signing swans then are heard there.

Golding:

Cayster heareth not mo songs of swannes then doth the same.
————non illo plura Caystros
Carmina eyenorum labentibus audit in undis.

Sandys অক্ষরের দিকে বেশি ঝুঁকেছেন। Labentibus আছে বলে flowly-gliding অনুবাদ করলেন; in undis এর ভাব বোঝবার চেষ্টা করলেন waters beare বলে। Golding ও পথেই গেলেন না, তিনি ছন্দের (Fourteeners) আয়তনের মধ্যে, যে ধ্বনির জন্যে চিত্রটি প্রধানত পরিস্ফুট (Cayster নামটি অবশ্যই আর একটি বেধ), তাকে বাঁধবার চেষ্টা করলেন। তাঁকে বাধ্য হয়ে কয়েকটি কথা বাদ দিতে হল, কিন্তু মূল ছন্দের একটা আভাস এল। Sandys-এর নিজের ছন্দই যেন এ অনুবাদের অন্তরায়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কি কর্তব্য। আক্ষরিক বনাম ছান্দিক ব্যাখ্যা কোনটা শ্রেয়! ছন্দ কথাটি অবশ্য ব্যাপকভাবে ধরা হচ্ছে। বলাবাহুল্য পদ্য অনুবাদে ছন্দ একটি অন্যতম বাহন যার মাধ্যমে অনুবাদ তথা কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গিই ফুটে ওঠে। মনে হয় Golding-এর একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে যা Sandys-এর নেই।

Frigora dant rami—বরং ফরাসী বা ইতালিআন ভাষায় রূপান্তর অপেক্ষাকৃত সহজ, ইংরেজিতে কঠিন।* Sandys-এর অনুবাদ :

The trees create fresh ayr ; Golding: The boughs doe yeelde a coole fresh air। এই হল প্রথম statement। এর পরেরটি হল—tyrios humus umida flores (স্যাঁতসেতে মাটীতে নানারকমের ফুল) এবং তৃতীয়টি perpetunm ver est—চির বসন্তের কথা—প্রথমে দুটি image-এর সাহায্যে তৃতীয় মন্তব্যটি তৈরী।

* প্রভ'সলও দ্রষ্টব্য, যথা—Antet e bas entreh prim fuoills.

যেখানে কবিতায় statement বা উক্তি আসে অথবা যেখানে চিত্র নিরাভরণ উক্তিরই সামিল (যেমন frigora dantrami), সেখানে অনুবাদ করা কঠিন হবে সহজেই অনুমেয়। রূপান্তরের মাঝে ভাষা সেখানে চলতে ফিরতে বড়ই কম জায়গা পায়।* সে যাই হোক এই দুজন অনুবাদক কি করেছেন আর একবার দেখা যেতে পারে।

Sandys:

The trees create fresh ayr, th' Earth various flowers.
Where heat nor cold the eternall spring devours.

Golding:

The boughs doe yeelde a coole fresh ayre the moisture of the ground
Yeelds Sundrie flowers; continuall spring is all the yeare there found.

Sandys-এর অনুবাদ আংশিক বলে, yeelde-এর অনুবাদ কাব্যমণ্ডিত—yeelde কথাটির পুনরাবৃত্তির জন্য একটা মন্তব্যেরও ভাব আসে, মন্তব্য করা মূল কবিতারও উদ্দেশ্য, কারণ তার পরেই আসে লীলায়িত Proserpine-এর ফুল কুড়োনোর বর্ণনা।

.....ant violas ant candida lilia carpit

Sandys:

Or Violets pulls, or Lillyes of all sorts

* ল্যাটিনের সংহত কাব্য রচনার জন্যে সাধারণ ইংরেজি তথা অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় রূপান্তর করতে গেলে কথা ছেড়ে যায়। কিন্তু নিচের দৃষ্টান্তটি থেকে দেখা যাবে যে সংহত Herrick-এর কাব্য রচনা তথা ইমেজগুলির রূপান্তর করতে গিয়ে ল্যাটিন রচনা পর্যন্ত বড় হয়ে যাচ্ছে।

Herrick:

Smooth was the sea and seem'd to call
Two prettie girles to play withall;
Who padling there, the sea soone frown'd
And on a sudden both were drown'd.
What credit can we give to seas,
Who, kissing, kill such saints as these?

ল্যাটিন অনুবাদ:

Ridebut facies maris duasque
ad lusus lepidas uocat puellas.
at mox, ludere dum iuuat per undas,
frontem sollicitat trahitque rugas,
atque ambas subito uorauit aestu,
quae, Neptune, fides tibi futurast,
tales qui perimis, sed osculando?

—Postgate

অনুবাদকের padling কথাটি অনুবাদ করতে মুস্কিল হচ্ছে, ফলে অযথা একটি লাইন বেড়ে গেল—(at mox), ludere dum iuuat per undas। তাছাড়া ছিটিও ঠিক রইল না। iuuat per undas আরোপ করা হয়েছে। Saints-এর অনুবাদ কই?

দুটি or অবশ্যই ল্যাটিনের অবিকল ant (ফরাসীতে যেমন on . . . on), কিন্তু তিনি of all sorts পেলেন কোথা থেকে?

Golding:

In gathering either Violets blew, or Lillies white as Lime.

ল্যাটিনে শ্বেতবর্ণ লিলির উল্লেখ আছে, কিন্তু 'নীল' violets-এর কথা নেই আছে শুধু violets। তাছাড়া Lime কথাটি মুখ্যত ছন্দ বজায় রাখবার জন্যে এসেছে যদিও তাতে অনুবাদ ব্যাহত হয়নি।

এর পর কামোন্মত্ত Dis-এর ধর্ষণের কাহিনী—স্বল্প-নাটকীয় দু'এক লাইনে এবং তারই মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধে একটি মন্তব্য—

issque adeo est properatus amor.....

Sandys লিখেছেন—Love could not brooke delay! এখানে তিনি পুরো স্বাধীনতা নিয়েছেন এবং মূল লাইনটির প্রতি সুবিচার করেননি।

Golding অপর পক্ষে বাড়তি কথা বসালেও মূল কবিতার ভাবটি বজায় রেখেছেন:

So hastie, hote, and swift a thing in Love, as may appere.

ধর্ষিতা Proserpine ভয়ে চিৎকার করে ডেকেছে তার সখিনীদের, তার মাকে—বিশেষ করে তার মাকে।

. . . . dea territa maesto
et matrem et comites, sed matrem saepius, ore
clamat . . .

Sandys এর অনুবাদ—

The sad-fac't Goddene cryes (with beare appall'd)
To her companions, oft her mother call'd.

মূল কবিতাটিতে matrem কথাটি দুবার উল্লেখিত হয়েছে, Sandys তাঁর স্বল্প জায়গার মধ্যে ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারেন নি, মায়ের কথাটি দু'বারের বদলে কোনো রকমে যেন একবার বলে খালাস। অথচ অতি নিপুণভাবে Golding অনুবাদ করেছেন:

The Ladie with a waiting voyce afright did often call
Hir Mother and hir waiting Maides, but Mother most of all.

বলাবাহুল্য but Mother most of all (sed matrem saepius) বলাতে আবেগ আরও অনেক বেশি ফুটে ওঠে। ধর্ষিতা Proserpine-এর এই কাহিনীর মধ্যে আরও দুটি মর্মস্পর্শী লাইন:

tantaque simplicitas puerilibus adfuit annis,
haec quoque virginem mouit iactura dolorem.

ল্যাটিন ভাষার প্রথাসিদ্ধ precision Sandys অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করেছেন। যদিও ধ্রুপদী রীতির ভাষান্তর অসম্ভব তবু যেখানে Golding অন্তত চেষ্টা করেছেন সেখানে Sandys কোনো চেষ্টা না করে আমাদের বিভ্রান্তই করেন।

উপরোক্ত দুটি লাইন Sandys অনুবাদ করেছেন:

And such was her sweet youth's simplicitie
That their loss also made the Virgen crie.

এবং Golding:

And such a sillie simplenesse hir childish age yet beares
That even the verie loss of them did move hir more to tears.

Golding-এর প্রত্যেকটি কথা মূল কবিতার প্রত্যেক কথাকে রূপায়ন করবার চেষ্টা করেছে। puerilibus adfuit annis—স্বাভাবিক ল্যাটিন ভাষার ঐশ্বর্য বহন করে, তাকে ব্যাকরণগত আক্ষরিক অনুবাদ করলে যথেষ্ট হাসিরই খোরাক জুটবে, কিন্তু hir childish age yet bears নিশ্চিতভাবে মূল কবিতার লাইনটির অনুগত। Yet কথাটি লক্ষণীয়। শেষের তিনটি লাইনে স্মৃতিবিজড়িত স্থান, স্থানীয় দেবতাদের উল্লেখ (হঠাৎ প্রথাসিদ্ধ ধ্রুপদী কাব্যের নৈর্ব্যক্তিক কাব্যিক প্রশান্তি)। বলাবাহুল্য অনুবাদক মাত্রেই এখানে সাবধান হবেন, মূল কবিতাটির স্থান কাল পাত্র অনুবাদকের স্থান কাল পাত্রের বহু তফাতে, ব্যঞ্জনার রূপান্তর স্বভাবতই শক্ত।

et qua Bacchiadae, bimari gens orta Corintho
inter inaequales posuerunt moenia portus

Sandys এখানে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথাই বাদ দিয়েছেন, যেমন bimari, gens। অপর পক্ষে Golding করেছেন bimari=with the double seas আর gens=folke। এই দুটি কথা নিশ্চিতভাবে nuance, Golding তাকে উপেক্ষা করেননি।

Catullus-এর পাঁচ নম্বর গীতিকবিতাটি কবিতা পাঠকমাত্রেরই চিত্তগ্রাহী, এবং কবি মাত্রেই এর প্রভাব হয় কাব্যে আর নয় তো জীবনে দেখতে পেয়েছেন। Ben Jonson-এর come, my celia, let us prove এরই অবলম্বনে লেখা (প্রায় অনুবাদই), Campion এর কয়েকটি লাইন অনুবাদ করেছেন, পুরো অনুবাদ করেছেন Richard Crashaw এবং আধুনিক কালে Jack Lindsay।* আরও অনেকে করেছেন, আপাতত এঁদের দুজনকে নিয়ে আমাদের বিচার বিশ্লেষণ চলতে পারে।

Catullus: *Carmen V*

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus,
rumoresque senum severiorum
omnes unius aestimemus assis.
soles occidere et redire possunt.
nobis cum semel occidit brevis lux,
nox est perpetua una dormienda.
da mi basia mille, deinde centum,
dein mille altera, dein secunda centum,
deinde usque altera mille, denide centum
dein, cum milia multa fecerimus,
conturbabimus illa, ne sciamus,
aut nequis malus inudere possit,
cum tantum sciat esse basiorum.

* আলডাস হকস্‌লির একটি বড় কবিতার শিরোনামা–Soles occidere et redire possunt.

Come and let us live my Deare,
Let us love and never feare.
What the sowrest Fathers say:
Brightest sol that dyes today
Lives againe as blith to morrow,
But if we darke sons of sorrow
Set: ô then, how long a Night
Shuts the Eyes of our short light!
Then let amorous kisses dwell
On our lips, begin and tell
A thousand, and a Hundred, score
An Hundred, and a Thousand more,
Till another Thousand smother
That, and that wipe of another
Thus at last when we have numbered
Many a Thousand, many a Hundred;
Wee'l confound the reckoning quite;
And lose our selves in mild delight
While our joyes so multiply
As shall mock the envious eye.

—Richard Crashaw

Quick, Lesbia, let us live and love
At a brass farthing let us reckon
the talk of old morose-eyed men.
Suns sink, and burn again above
with us, when the brief light is broken,
there's one long night and sleep that's blind.

Give me a thousand kiss then,
a hundred, thousand, hundred more,
and then a thousand from your store,
a hundred, till in kissing-maze
we lose our counting in a daze
and cheat malicious men who find
their wondering envy flag behind.

—Jack Lindsay.

স্যাফোর সমগোত্রীয় ক্যাটালস সে যুগের অদ্বিতীয় গীতিকবি, যদিও তাঁর রীতি একেবারে ধ্রুপদী। যে কোনো মধ্যযুগের ল্যাটিন কবিতার সঙ্গে তুলনায় পার্থক্য সহজেই

ধরা যাবে। উপরোক্ত কবিতাটির 'লিরিক' সংবেদন যদিবা রূপান্তর করা সম্ভব, কিন্তু ধ্রুপদী চালের কাঠামোয় তাকে ধরা কঠিন। কাজেই Richard Crashaw-র অনুবাদ যদিও বহুলাংশে সার্থক, তথাপি প্রধান সমস্যা দেখা দিল lux, nox এবং perpetua una dormienda নিয়ে। হঠাৎ লাইনের শেষে কুঠারাঘাতের মতো lux কথাটি এবং তারই রেশ নিয়ে nox আর তার পরেই বিলম্বিত চালে perpetua una dormienda। অনুবাদ প্রায় অসাধ্য। তবু Ben Jonson-এর চেয়ে Crashaw বেশি ক্যাটলস ধর্মী এবং Crashaw set কথাটি যোগ্যভাবেই বসিয়েছেন এবং তার পরেই বিলম্বিত চালে শুরু করেছেন Ô কথাটি দিয়ে।

Suns that set may rise again
But if once we lose this light
'Tis with us perpetual night.
—Ben Jonson.

But if we darke sons of sorrow
set: Ô then, how long a Night
Shu'ts the Eyes of our short light!
—Crashaw.

Jack Lindsay-র পাণ্ডিত্য ও অনুবাদের হাত সর্বজনবিদিত। তাঁর উপরোক্ত কবিতাটির অনুবাদ নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য। Crashaw assis কথাটির তাৎপর্য না দেখিয়ে শুধু ভাবার্থটি দেখিয়েছেন। Lindsay অনুবাদ করেছেন (at) a brass farthing, একেবারে যথার্থ অনুবাদ। Talk, reckon, rumores, aestimemus, ইত্যাদির প্রায় আক্ষরিক অথচ যোগ্য অনুবাদ। বুড়ো মোড়লদের যে কবি পরোয়া করেন না তার জন্যেই assis কথাটির ব্যবহার; Crashaw-র অনুবাদে সে ঝাঁঝটুকু নেই। কবিতাটি পরকীয়া প্রেমের ওপর—Lesbia অবশ্যই Clodia, বিখ্যাত রোমান মহিলা। Metellus-এর স্ত্রী। শেষের দিকে conturbabimus অনুবাদ করেছেন Crashaw Wee'l confound। যথার্থ অনুবাদ। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সে যুগে একটি সংস্কার ছিল যে প্রেমের ক্রিয়াকলাপের হিসেব রাখাটা প্রেমিক যুগলের পক্ষে অমঙ্গল, সেই জন্যে তারা ইচ্ছে করেই প্রেমের দান প্রতিদানের হিসেব গুলিয়ে দিত। Jack Lindsay কেন যে অনুবাদ করেছিল we lose our counting in a daze তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। in a daze বললেই একটা রোমান্টিক ভাব আসে, Catullus-এর সে রকমের কোনো উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না, তিনি তদানীন্তন কালের একটি সংস্কারকে বিপুলভাবে প্রেমের কবিতায় কাজে লাগিয়েছেন এইমাত্র। ক্যাটলস লিরিক কবি বটে, কিন্তু রোমান্টিক নন। তাছাড়া conturbabimus একটি সূক্ষ্ম pun-ও বটে।

ল্যাটিন ধ্রুপদী ভাষা তথা কাব্যের চরম পরিণতি ভর্জিলের কাব্যে। এই নাগরিক কবির জুড়ি য়ুরোপে বোধকরি একমাত্র দান্তে ছাড়া আর কেউ ছিলেন না বা হননি। এবং ভর্জিলের কাছে দান্তের ঋণ সর্বজনবিদিত। বলা বাহুল্য আজ পর্যন্ত ভর্জিলের বহু অনুবাদ বেরিয়েছে, কিন্তু সব অনুবাদকের উদ্দেশ্য এক নয়। ভালেরি *Eclogues* পুরো অনুবাদ করেছেন, ভর্জিল ছিলেন তাঁর অন্যতম ধ্যান ধারণা; ভর্জিল অনুবাদের মধ্যে তিনি খুঁজতে চেয়েছিলেন এক বিশুদ্ধ অবস্থা যার উল্লেখ আমি পূর্বে করেছি।

কিন্তু তিনি যা চেয়েছিলেন তা করতে পেরেছিলেন কিনা তার বিচার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখতে পারা যেতে পারে।

Hic tamen hanc mecum poteras requiescere noctum
Fronde super viridi, Sunt nobis mitia poma,
castaneae molles et pressi copia lactis;
E jam summa procul villarum culmina fumant
Majoresque cadunt altis de montibus umbrae.

Reste encore cette nuit, Dors là tout près de moi
Sur ce feuillage frais. Nous aurons de bons fruits,
Fromage en abondance et de tendres châtaignes.
Vois: au lointain dejà les toits des fermes fument
Et les ombres des monts grandissent jusqu'à nous.

শেষের দুটি লাইনই সবচেয়ে বেশি বিচার্য। প্রকৃত পক্ষে grandissent ক্রিয়াপদটির মারফৎ শেষ লাইনটি রূপান্তরিত হল। Grandissent এবং cadunt দুটি ক্রিয়াপদের অর্থ এক নয়—প্রথমটি বাড়া, দ্বিতীয়টি পড়া। কিন্তু অর্থের তারতম্য তাতে হয় না। jusqu'a nous ব্যঞ্জনাপূর্ণ—বাড়তি কথা কিন্তু মূলের ধ্বনির তাল রাখবার পক্ষে সহায়ক। তাছাড়া jusqu'à nous বলাতে একটি ত্রিকোণ চিত্রের রূপও আসে—পাহাড়, পাহাড়ের উচ্চতা আর তার ছায়া তলা পর্যন্ত এসেছে যেখানে রয়েছি আমরা। পাহাড় ও মাটি দুটি লাইন, তৃতীয় লাইনটি ছায়া। ফরাসী অনুবাদে নেই inajores, নেই altis; কিন্তু grandissent jusqu'à nous বলাতে মূলের ব্যঞ্জনা রূপান্তরিত করতে পারা গেল। ভালেরির এই অনুবাদে মূল কবিতার ধ্বনিরও একটা আভাস আসে। ভালেরির সাধনা বিফলে যায়নি।

Robert Bridges চেয়েছিলেন Latin hexameter ইংরেজি hexameter-এ রূপান্তর করতে। C. Day Lewis মোটামুটি narration-এর দিকটিই বেছে নিয়েছেন। অবশ্য তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অনুবাদটি রেডিওতে পড়া। সেইজন্য ইংরেজি জগতে আধুনিক ইংরেজি ভাষায় সম্ভবত তাঁর পক্ষে আর অন্য কিছু করবার উপায় বা ক্ষমতা ছিল না। তিনি Ezra Pound-এর মতো নতুন নতুন মৌল rhythmic pattern উদ্ভাবন করতে পারেন না। কাজেই সাধারণভাবে তাঁর অনুবাদ উপভোগ্য হলেও ভর্জিল সম্বন্ধে নতুন কোনো কাব্যিক আগ্রহ জানায় না। Gwain Douglas dialect-এ অনুবাদ করেছেন, এবং যদিও তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল narration তবু C. Day Lawis-এর চেয়ে তাঁর অন্যান্য বিষয়ে, যথা চিত্র কল্পনা আগ্রহ ছিল। আর কেন জানিনা, সম্ভবত dialect-এ অনূদিত বলেই, Gwain Douglas-এর অনুবাদে এমন একটা সজীবতা আছে যা C. Day Lawis-এর আধুনিক ইংরেজি ভাষায় পাওয়া যায় না। বস্তুতপক্ষে সম্ভবত এই Scot-version টিই একমাত্র *Aeneid*-এর সার্থক অনুবাদ ইংরেজি জগতে।

তবে ভর্জিল রূপান্তর অসম্ভব। এবং যেহেতু তাঁর কাব্যই য়ুরোপীয় সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ড, সেহেতু তাঁর বিপুল পরিণতিকে বোঝাবার জন্যেই অনুবাদের প্রয়োজন।

নিচে যে তিনটি উদ্ধৃতি দেওয়া হোলো তা থেকেও এ কথার তাৎপর্য কিছুটা বোঝা যাবে।

Aeneid IV

Ibant obscuri sola sub nocte per umbram
perque domos Ditis vacuas et inania regna
quale per incertam lunam sub luce maligna
est iter in silvis, ubi caelum condidit umbra
luppiter, et rebus nox abstulit atra colorem
vistibulum ante ipsum primis in faucibus Orci
Luctus et ultrices posuere cubilia Curae,
pallentesque habitant Morbi tristisque Senectus,
et Metus et malesuada Fames ac turpic Egestas,
terribiles visu formae, Letumque Labosque,
tum consanguineus Leti sapor et mala mentis
Gaudia, mortiferumque adverso in limine Bellum
ferreique Eumenidum thalami et Discondia demens
Viperum crinem vittis innexa cruentis.
In medio ramos annosaque bracchia pandit
ulmus opaca, ingens, quam sedem Somnia vulgo
vana tenere ferunt, foliisque sub omnibus haerent.
multaque praeterea variarum monstra ferarum,
Centauri in foribus stabulant Scyllaeque biformes
et centumgeminus Briareus ac belua Lernae
horrendum stridens, flammisque armata Chimaera,
Gorgones Harpyiaeque et forma tricorporis umbrae

Robert Bridges-এর আক্ষরিক অনুবাদ ইংরেজি hexameter-এ :

They wer' amid the shadows by night in loneliness obscure
Walking forth i' the void and vastly dominyon of Ades ;
As by an uncertain moonray secretly illumin'd
One goeth in the forest, when heav'n is gloomily clouded,
And black night hath robb'd the colours and beauty
from all things,
Here in Hell's very jaws, the threshold of darkening Orcus,
Have the avenging Cares laid their sleepless habitation,
Wailing Grief, pallid Infections, and heart-sticken Old-age,
Dismal Fear, unholy Famine, with low-groveling Want,
Forms of spectral horror, gaunt Toil and Death the devourer
And death's drowsy bother, Torpor, with whom, an inane rout,
All the Pleasures of Sin ; there also the Furies in ambusht

Chamber of iron, afore whose bars wild War bloddy handed
Raged, and mad Discord high brandished her venomous locks.
Midway of all this tract, with secular arms an immense elm
Reareth a crowd of branches, aneath whose leafy protection
Vain dreams thickly nestle, clinging unto foliage on high :
And many strange creatures of monstrous form and features
Stable about th' entrance, Centaur and Scylla's abortion,
And hundred-handed Briarens, and Lerna's wildbeast
Roaring amain, and clothed in frightful flame the Chimaera,
Gorgons and Harpies, and Pluto's three-bodied ogre.

Gawain Douglas (1513 A.D.):

Thay walkit furth so dirk oneither they wyst
Quhidder thay went amyddis dym schaddois thare,
Quahare ever is nicht, out never licht doith repare,
Throwout the waist dungeoun of Pluto king,
Thay vode boundis and that gousty ring,
Sicklyke as quha wald throw thik woddis wend,
In obscure light quhare mone may not be kend,
As Jupiter the king Ethereal
With erdis skug hydis the heuynnys al,
And the mirk nycht with hir visage gray
From every thing has reft the hew away.

Before the portis and first jawis of hel
Lamentacioun and wraikful Thochtis fel
Thare lungeing had, and thereat duellis eik
Pale Maledyis that causis men be seik,
The fereful Drede and als unweildy Age,
The felloun Hunger with her undauntit rage
Thare was also the laithly Indigence
Terribil of schape and schameful hir presence
The grisly Dede that mony one has slane
The hard Labour and the diseisful Pane,
The slottry slepe Dedis cousing of Kynd,
Inordinate Blithenes of perversit mind :
And in the zet forgaines thaym did stand
The mortal Battel with his dedely brand,
The irne chalmeris of hellis Furies fel,

Witless Discord that woundring maist cruel,
Womplit and buskit in ane bludy bend,
With snakis hung at every haris end.

And in the myddis of the utter ward,
With brade branchis sprede over al the sward,
Ane rank elme tre stude, huge grete and stok auld:
The vulgar pepil in that samyn hauld
Belevis thare vane Dremes makis thare duelling,
Under ilk leaf ful thik thay stick and hing
Thare bene eik monstouris of mony divers sort,
The Centauris war stablit at thir port,
The donbill porturit scylla with thaym in fere,
Briarens with ane hundreth formes sere,
The byisning beist serpent of Lerna,
Horribill quhissilland and queynt chimeran
With fire euarmyt on hir toppis hie,
The laithlye Harpies, and the Gorgonis thre,
Of thrinefald bodyis gaistly formes did grone,
Baith of Erylus and of Gerione.

C. Day Lewis:

Dimly through the shadows and dark solitudes they wended,
Through the void domiciles of Dis, the bodiless regions:
Just as, through pitful moonbeams, under the moon's thin light.
A path lies in a forest, when Jove has palled the sky
With gloom, and the night's blackness has bled the world of colour
See! At the very porch and entrance way to Orcus
Grief and ever-haunting Anxiety made their bed:
Here dwell pallid Diseases, here morose old Age
With Fear, ill-prompting Hunger, and squalid Indigence,
Shapes horrible to look at, Death and Agony;
Sleep, too, which is the cousin Death, and guilty Joys,
And there, against the threshold, War, the bringer of Death:
Here are the iron cells of the furies, and lunatic strife
Whose viperine hair is caught up with a headband soaked in blood
In the open a huge dark elm tree spreads wide its immemorial
Branches like arms, whereon, according to old wives' tales,
Roost the unsolid Dreams, clinging everywhere under its foliage. . . .

আধুনিক সাহিত্য

১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত আধুনিক কয়েকজন ইংরেজ কবির কাব্য-পর্যালোচনা সম্পর্কিত একখানি বইয়ের ভূমিকায় বলা হয়েছিল যে, আধুনিক কবিতা সামান্য রমণীয়তার (prettiness) অভিপ্রায়ী নয়; আধুনিক যান-বাহনের দ্রুততার ফলে বর্তমানে যেহেতু গ্রাম ও নগরের মধ্যবর্তী ব্যবধান সাধ্যানুসারে কমিয়ে দেওয়াটা আমাদের ইচ্ছাধীন হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেজন্যে আধুনিক কবিতায় নগরের অভ্যস্ত পরিবেশ রূপায়ণের পাশাপাশি এবং সেই একই প্রচেষ্টায় কবিরা গ্রাম-প্রকৃতির স্বপ্নমাধুর্য স্মরণ করে থাকেন; এক ভাব থেকে তাঁরা খুবই তাড়াতাড়ি অন্য ভাবে, অন্য রূপে মনঃসংযোগ করেন এবং তার ফলে আধুনিক কবিতা অনেক সময়ে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়; একালের কবিরা জীবনের রূঢ় বাস্তবতা কিছুতেই এড়িয়ে চলতে চান না, অর্থাৎ তাঁদের কবিতা তাঁদের অধ্যুষিত পৃথিবীর বস্তুচ্ছায়াকে ছায়া-মাত্র বলে উপেক্ষা করতে চায় না; আত্মস্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যয় প্রবল এবং সেইজন্যেই তাঁরা ভাবে, ভাষায় বিশেষ সাহসী; সমাজে অধ্যাত্মবোধ একালে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন; মিল্টন অথবা বার্ডস্বার্থের মতন তাঁরাও শ্রেণী-সমাজের অস্তিত্বে ঘৃণা প্রকাশ করেন, তবে তাঁদের কবিতায় এই ঘৃণা উচ্চারণের জোরটা অপেক্ষাকৃত কম; প্রথাগত ধর্মানুষ্ঠান ও চিরাগত ধর্মসংস্কারকে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল আচরণের প্রতীক বলেই গ্রহণ করে থাকেন; প্রেম, মৃত্যু, বার্ধক্য এবং কালস্রোতের পরিবর্তন চিরকালের মতন একালেরও কবিতার বিষয়।

সংক্ষেপে এ-বিষয়ের মূল কথাগুলি বেশ সহজ করে বলা হয়েছিল সেখানে। সে অবশ্য ১৯৪০-এর কথা এবং এসব বিশ্লেষণ প্রধানতঃ ১৯৪০-এর আগেকার 'আধুনিক ইংরেজি কবিতা'র বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক সম্পর্কিত। বাংলা কবিতা উনিশ শতক থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত নানা স্তরের ইংরেজি এবং অন্যান্য য়ুরোপীয় কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এসেছে। বর্তমানে আমাদের কবিরা বিশ বছর আগেকার মতো ততোটা দুর্বোধ্য নন। পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে মানব-জীবনের রূঢ় বাস্তবতা অপসারিত হয়েছে কিনা জানি না, তবে যে প্রান্তে আমাদের বাস, সেখানে ইতিমধ্যে মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক বিরোধ, দেশ-বিভাগ, বেকার ও উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি ব্যাপক ধরনের জাতীয় দুর্যোগ এবং তা'ছাড়া আমাদের নিত্য-অভ্যস্ত গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত বিরোধের স্রোত বয়ে গেছে। সুতরাং অধ্যাত্মক্ষেত্রে বিচলিত বোধ করলে কবিদের এখন আর দোষ দেওয়া যায় না। শরীর, মন এবং আত্মার সম্পর্ক বড়ো জটিল। আত্মা আছে কি নেই, সে-ভাবনা এক্ষেত্রে অবান্তর। সুতরাং সে-কথা উহ্য থাক। তবে, শরীরও পরিদৃশ্যমান, মনও নিত্য-অনুভূত। অতএব সে দুটি দিক স্বীকার্য। কবিতায় আন্তরিকভাবে কবিরা নিজেদের স্বাস্থ্যের পরিচয় দিতে বাধ্য। কারণ, কবিত্ব হোলো অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির পক্ষে এ-রকম প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া যে অসম্ভব, সে-কথা জনসাধারণের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে স্ব-ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সমর্থন করবেন। আর স্বাস্থ্য তো কেবল শারীরিক নয়,—শারীরিক এবং মানসিক দুই-ই।

নতুন বাংলা কবিতার কয়েকখানি বইয়ের দিকে চোখ রেখে এই স্বাস্থ্যের কথাটা বিশেষ-

ভাবে মনে এলো। 'দরজা এবং স্থবিরতা' শিরোনামটি দেখলেই মনে হয় 'আধুনিক'। "মিলিত সংসার" কবিতাগ্রন্থের লেখক শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য তাঁর এই কবিতায় লিখেছেন—

খুলো না দরজার খিল। দাও
শান্তিতে থাকার
নিরিবিলি অবকাশ। কেননা বাইরে
প্রমত্ত নির্দয় ভিড়।

সুস্থ নই, দেহে মনে
আলজ্জ জঞ্জাল, তাই
শীতের শুভ্রতা দাও, বিছাও চাদরে
ঘরময়, জানালার সুনীল শার্সিতে।

এই অসুস্থতা 'মিলিত সংসার'-এর একটি মাত্র রচনাতেই যে নিঃশেষে বলা হয়েছে, তা নয়। বইয়ের প্রথম কবিতাটির নাম 'জ্বর'। তাতে তিনি বলেছেন—

আমি এই শতাব্দীর জ্বরা নিয়ে গায়ে
একা বিছানায় শুয়ে আছি।

'নিরাশা', 'অসংযত পাগল ইচ্ছারা' ('প্রেমিক'), 'শূন্য ঘর, কঠিন হাওয়া' ('আয়না তবে আলো'), 'ক্লান্ত আকাশ' ('গোপন অস্থির'), 'সমস্ত যৌবন ধরে অবিরাম দীনতার ভার প্রত্যহই ঢেকেছে শরীর' ('ঘর') ইত্যাদি স্বাস্থ্যহানির উল্লেখ তাঁর অনেক রচনাতেই বিদ্যমান। তারই মধ্যে দেখা গেল একটি উক্তি—'ফড়িং যেমতি উড়ে যায় পাখাটুকু ছুঁয়ে ছুঁয়ে'! অবিশ্যি 'যেমতি' শব্দটা একালে বুদ্ধদেব বসুর নতুন স্বাক্ষরে কাব্যানুরাগীর স্মৃতিতে বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে আছে। হয়তো বুদ্ধদেব বসুর সেই 'নেপথ্য-নাটক' পড়বার ফলেই ও-শব্দ তাঁর মনে ধরে গেছে; কিন্তু শব্দানুকরণের কথাটিও স্বাস্থ্যহানির সূত্রে বিবেচ্য। শরীর দুর্বল হলে মনটাও প্রায়শই দুর্বল হয়ে পড়ে—যদিও এ-ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম অসম্ভব নয়। ডায়মণ্ডহারবারের রাত্রি দেখেছেন তিনি; সেই রাত্রি-রূপের মধ্যেও তাঁর মনের বিষণ্ণতা বাড়িয়ে দেবার উপকরণই প্রধান ছিল বলে মনে হয়। রাত্রির 'অমেয় কান্না' এবং 'বেদনার বুকভরা স্মৃতি' নিয়ে তিনি ঘরে ফিরেছেন,—হয়তো তাঁর বহুবর্ণিত সেই সংকীর্ণ ঘরেতেই! এসব খুবই দুঃখের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু কবিদের ঘর আরো প্রশস্ত করবার উপায় কি হতে পারে? জীবনে অভাব, বিরোধ, অভিযোগ ইত্যাদি দুঃখের অভিজ্ঞতা কিছু কিছু আছে, ছিল এবং থাকবেও। সেই সত্য অস্বীকার করবার নয়। বড়ো কবি সমুচিত উৎসাহের জোরেই তাঁর সত্তার মধ্যে এসব গ্রহণ করে থাকেন। আধুনিক বাংলা কবিতার অন্ততঃ এই ধরনের লেখাগুলির মধ্যে কবিস্বভাবের আবশ্যিক সেই উৎসাহ-ধর্মের অভাব দেখা যাচ্ছে। যাঁরা এখনো এইরকম উৎসাহমান্দ্যকে যুগোচিত আধুনিকতা বলছেন, তাঁদের কথাও হয়তো ফেলবার নয়। কিন্তু অরুণ ভট্টাচার্য বা অন্য কোনো কবির ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ দূরে রেখে এই কথাটা জোর করে বলবার সময় এসেছে যে, দীর্ঘকাল ইনিয়ে বিনিয়ে শোক প্রকাশ করা সুবিবেচনা নয়,—জীবনেও নয়, কাব্যেও নয়। এই ধরনের দুর্বলতার ফলে মন আপনার শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব হারিয়ে ফেলে। গভীর কাব্য দুর্বোধ্য হতে পারে বই কি! কিন্তু সামান্য উত্তেজনাকে অস্পষ্ট ভাষায় বাহিত হতে দেওয়াই কি কবির কাজ? এই সূত্রে 'সময় নদী মন' নামে একটি লেখার প্রথম চার লাইন তুলে দেখা দরকার—

আমাকে ভাবায় মন, বলে, নদী হও।
কাজলদীঘির পথ,—শালিক পুরুষ
হরিণীকে ভালোবাসে। এমন নির্মম
নদীর শরীরকে নিয়ে তার সুখ নেই।

'শালিক পুরুষ হরিণীকে ভালোবাসে' সংবাদটি মোটেই যে বোধগম্য হয়নি সে-কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই। আমাদের নবীনতম কবিদের কাছে পাঠকের এই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো দরকার যে তাঁরা যেন এ-ভাবে আমাদের আর উপেক্ষা না করেন।

এই শোক-শ্রান্তি-শালিক-হরিণ-ঘটিত অবসানের পরেই মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের "কটি কবিতা ও একলব্য" হাতে এলো। তিনিও যন্ত্রণার কথা বলেছেন। কিন্তু সে-যন্ত্রণার নামটিও বিশেষণে বিশেষিত, তার প্রকৃতিও অন্যবিধ। মঙ্গলাচরণ বলেছেন, 'জননী যন্ত্রণা'! এমন পরমাশ্চর্য নাম এতোদিন মনে মনে চেয়েছি, তবু মেলেনি। নামটিতেই কবিতার স্বাদ পাওয়া গেল। তারপর নাম থেকে রচনায় দৃষ্টি ঝাঁপিয়ে পড়লো—

জন্মে মুখে কান্না দিলে, ভাসিয়ে দিলে ভেলা
একূল-ওকূল দুকূল-মজা কালনাগিনীর দ'য়
জলকে দিলাম সাঁতার দিলাম ঢেউকে হেলাফেলা
ভয়কে দিলাম ভরাডুবি—কান্না আমার নয়।
কালিঢালা নদী, বাঁকে ও-কার নৌকো, আলো
নেই—মনিষ্যি তেপান্তরে পথ চিনে কে যায়?
সে আমি সেই আমরা—আমরা কে মন্দ কেউ ভালো
কেউ মাঠে কেউ ঘরে কেউ-বা কলে-কারখানায়।

এখানকার শব্দে, ছন্দে, ছবিতে, খুশিতে যাবতীয় যন্ত্রণার যেন রূপান্তর ঘটে গেছে! এতে যন্ত্রণার পাশ কাটিয়ে যাবার চালাকিও নেই, আবার যন্ত্রণাকে নিয়ে বন্ধ ঘরে সুদীর্ঘ অনুশোচনারও আয়োজন নেই। বাইরের বিভিন্ন বাধা এবং বিরোধ সত্ত্বেও নিজের মনের গভীরে তিনি যে কবিজনোচিত উৎসাহ বোধ করেছেন, সে উৎসাহের জন্যে তিনি মোটেই কুণ্ঠিত নন। উৎসাহ সত্যিই লজ্জার ব্যাপার নয়। কোনো কোনো জ্ঞানী আধুনিক কবিকেও এ-বিষয়ে অদ্যাবধি সংশয়গ্রস্ত দেখা যায় বলেই এ কবিতার আরো ক'টি ছত্র তুলে দেখানো দরকার—

একটি তারা-পিদিম কখন হাজার তারা জ্বালে :
এক ছেলে হারালে—ছেলে এলাম হাজার জনা
একটি আশা অনেক মুখের পাপড়িতে মুখ মেলে :
এক নামে যেই ডাকলে—অনেক হলাম যে একজনা।
ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা—
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা।

মঙ্গলাচরণ প্রতিষ্ঠিত আধুনিক কবিদের অন্যতম। তাঁর মধ্যে আধুনিক সংস্কারের যে বাড়াবাড়িটা ব্যক্তিগতভাবে আমার পছন্দ হয়নি, এবার সে-দিকটির কথাও বলা দরকার। ক্ষুধা, ভুখ-মিছিল, চামড়া ফুঁড়ে ওঠা পাঁজরা, হাঁ-করা মুখে ভন্‌ভনিয়ে মাছি ওড়ার দৃশ্য ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ যখন একাধিক কবিতায় বার-বার দেখা দেয়, তখন তাতে আর কবিতার বিস্ময় থাকে না,—সেটা নিতান্তই প্রাত্যহিক অনিবার্যতা বলে মনে হয়। তবু,

যে-হেতু তিনি সত্যিকার আবেগ দিয়ে এসব কথা বলতে অভ্যস্ত, সেই জন্যেই তাঁর এই ধরনের অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্যে তিনি এমন দু'-একটি ইশারা ফেলে যান যেগুলি বহুকাল মনে থাকে,—হয়তো কখনোই ভোলা যাবে না! 'বেনের বাইজি কলকাতা' এমনি উক্তিরই নমুনা। 'যন্ত্রণা' তাঁরও অন্যতম প্রধান বিষয় এবং বক্তব্য। মা এবং সন্তান সম্পর্ক অবলম্বন করে বাৎসল্য-রসিক বাঙালী মনে তিনি আধুনিক সমাজ-বন্ধনের শ্রেণীবৈষম্যদোষের কথা অবিরত প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন। যথার্থ কবিতা কিন্তু কবি-মনের এ-ধরনের সজ্ঞান অতি-নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ থাকে না। তিনিও নিশ্চয় এ-নিয়ন্ত্রণে চিরকাল অন্তরীণ থাকবেন না। তাঁর "একলব্য" তাঁর সুনিশ্চিত কবিমনেরই সৃষ্টি! দেশের ঐতিহ্যে আশ্রয় নিয়ে অতীতের প্রথা, ধারণা, আবেগ অথবা বিশ্বাসকে নিজের দেশ-কালের উপযোগী করে পুনর্ব্যাখ্যান ও নবরূপায়ণের দিকে তাঁর বিশেষ সংকল্পের উদাহরণ এই রচনাটি। এ-কাজ তিনি অন্যত্রও করেছেন। বাৎসল্য ভাবের দিকে এই কারণেই তিনি অনুরাগী। 'এ-জমি' কবিতাটির শেষ দুছত্র পড়লেই রামপ্রসাদের প্রসিদ্ধ লাইন মনে পড়ে। তেমনি "একলব্য"-তে তিনি দ্রোণের হার এবং একলব্যের জিৎ দেখিয়েছেন। একলব্য আঙুল কেটে দ্রোণগুরুর দক্ষিণা জুগিয়েছেন বটে কিন্তু সেই গুরুদক্ষিণার ফলে গুরুর মন গ্লানিতে ভরে গেছে,—অপর পক্ষে, শিষ্যের দলে সম্মিলিত বনবাসীদের মনে প্রতীক্ষা আরো তাঁর হয়ে উঠেছে, বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় হবার সুযোগ পেয়েছে। কিসের প্রতীক্ষা? কিসের বিশ্বাস?

কখন কখন আসবে! কে? সে!
কখন বাতাস বন্ধ চোখ ধন্দ কখন চিৎকার চিরবে চরাচর ভাসবে
রক্তের থৈ থৈ ভাসবে পূর্ব ও পশ্চিম ভাসবে উত্তর দক্ষিণ
আসবে আলো আসবে আলো :

সংসারের কেন্দ্রে কবে, কবে-যে দোলনায় দুলবে অন্য এক শিশু, ভবিষ্যৎ! সম্মিলিত বনবাসীদের মনে এই রক্তক্ষুধাময়ী আশা আরোপ করেছেন মঙ্গলাচরণ। এই আরোপ তাঁর বিশেষ শ্রেণীবিলোপনীতির দান। সে বিষয়ে বিতর্ক অবান্তর। কিন্তু এ রচনায় কবি-কল্পনার চিহ্ন যে ইতস্ততঃ নানা ছত্রে ছড়িয়ে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এবং নবনীতা দেব দু'জনেই অপেক্ষাকৃত নবাগত। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের 'আধুনিকতা' "বিষ্ণুবরেখা"-গ্রন্থনামের মধ্যেই নিহিত। তাক-লাগবার দিকে তাঁর খেয়ালটা বড়োই চোখে পড়ে। 'ব্যালেরিনা', 'লেজেন্ড এবং স্কেচ',—কিংবা 'কোঁকড়া স্বপ্ন', 'শিশ্নকণ্ঠের তরতাজা স্তবক', 'এক পুরুষভর যন্ত্রণা' ইত্যাদি নামের এবং উক্তির দুর্বলতা থেকে তিনি অচিরেই সুস্থ হয়ে উঠবেন, এই কামনা। নবনীতা দেবও 'আধুনিক'। তাঁর 'রেখা'-কবিতাটিতে আধুনিকতা ফুটেছে বলে হয়তো তিনি মনে করেছেন। সেটির তুলনায় অনাধুনিক 'সোনার হরিণের ছড়া'-ই বরং বেশি ভালো লাগলো।*

হরপ্রসাদ মিত্র

* মিলিত সংসার—অরুণ ভট্টাচার্য। কবিতা মেলা। কলিকাতা, ১২। মূল্য দুই টাকা।
কটি কবিতা ও একলব্য—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। মূল্য দুই টাকা।
বিষ্ণুবরেখা—অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। কবিতা মেলা। কলিকাতা, ১২। মূল্য দুই টাকা।
প্রথম প্রত্যয়—নবনীতা দেব। এম. সি. সরকার আ্যান্ড সন্স। কলিকাতা, ১২। মূল্য দেড় টাকা।

সমালোচনা

Anatomy of a Murder. *By* R. Traver. Faber & Faber. London. 16*s*.

পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যের অনেকটা বোধহয় সবচেয়ে জনপ্রিয় অংশ জুড়ে আছে যাকে ইংরেজি ভাষায় বলা হয় 'ক্রাইম ফিকশন' অর্থাৎ অপরাধঘটিত উপন্যাস। অবশ্য যেমন তেমন অপরাধ নয়, একেবারে ফৌজদারী আইনের চরম কাণ্ড—মানুষ খুন। নচেৎ গল্প জমবে কি নিয়ে? আবার যেমন তেমন খুন নয়—যা অহরহ ঘটছে ও যার সমাধান পুলিস সহজে করতে পারে। এই সব উপন্যাসের রচয়িতারা অনেক মাথা ঘামিয়ে এমন সব হত্যাকাণ্ড উদ্ভাবন করেন যার সুরাহা করতে পাঠকদের মাথার চুলও প্রায় পাকবার যোগাড় হয়। তারপর দেখা যায় নিতান্ত গোবেচারি কোনো এক ব্যক্তিই হল অপরাধী। তা হল একরকমের লুকোচুরি খেলা। গল্প-রচয়িতা আপ্রাণ চেষ্টা করেন এই ব্যক্তিটিকে অন্যান্য নানা ব্যক্তি ও নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে আর পাঠকদের লক্ষ্য থাকে ঐ সব জটিল ঘটনার জাল ছিন্ন করে অপরাধীকে খুঁজে বের করা।

আলোচ্য উপন্যাসটির গোত্র যদিও 'ক্রাইম ফিকশন' তবু এর চরিত্র একেবারে ভিন্ন। এতে কোথাও ঐ জাতীয় লুকোচুরি নেই। অপরাধী স্বয়ং পুলিসের কাছে ধরা দিয়েছেন উপন্যাসটির উপক্রমণিকায়। তারপর বিচারের পালা। এইখানেই হল জটিলতা আর লেখকের মুন্সিয়ানা। লেখক রবার্ট ট্রেভার এক সময়ে ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটার অর্থাৎ ফৌজদারি মামলার সরকারি উকিল। এখন তিনি হাইকোর্টের জজ। বিচারক ও উকিল হিসেবে তাঁর সঞ্চিত ব্যাপক ও বিচিত্র অভিজ্ঞতাই নিঃসন্দেহে এই উপন্যাসের মালমশলা জুটিয়েছে।

গল্পটির কথক আসামী পক্ষের উকিল। অনেক দ্বিধার পর মামলার ভার নিতে রাজি হন আসামীর স্ত্রী (নামের কি দরকার?) উপরোধে। আসামী কিন্তু নির্বিকার। জনৈক হোটেলওয়ালা তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে, অবিলম্বে ঐ হোটেলওয়ালাকে খুন করে সে পরম তৃপ্তির সঙ্গে পুলিসের হেফাজতে দিন কাটাচ্ছে। এইখানে গল্পের শুরু।

ঘটনাটি ঘটে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেটের লেক সুপিরিয়রের তীরবর্তী মনোরম অঞ্চলে। ঘটনা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে লেখক ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে-ছবি এঁকেছেন তা উপভোগ্য। তার চেয়ে কম উপভোগ্য নয় ঐ ধর্ষিতা নারীর দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনা। আর ধর্ষণের নানা খুঁটিনাটি। এইখানেই বইয়ের নামের 'এনাটমি' কথার সার্থকতা—যদিও ঠিক লেখকের অভিপ্রেত অর্থে নয়। যাই হোক, পাঠক হিসেবে এ-কথা আমি না মেনে পারিনি যে একচল্লিশ বছর বয়স সত্ত্বেও নায়িকা সত্যিই রমণীয়—একেবারে আক্ষরিক অর্থে, লেখকের ভাষায় 'Shockingly desirable.'

আগেই বলেছি গল্পটি জমেছে বিচারের পালায়। দুই পক্ষের উকিলের ধস্তাধস্তি—প্রায় মেড়ার লড়াইয়ের সামিল, মাঝে মাঝে বিচারকের টিপ্পনি আর জুরারদের হাবভাব (মনোভাব তো নিছক অনুমানের ব্যাপার)। শেষ পর্যন্ত এই জুরাররা রায় দিলেন আসামী

নির্দোষ, মনোবিকলন বিশারদ সাক্ষীর মতে হোটেলওয়ালাকে খুন করার সময়ে আসামী এতটা অপ্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন যে ন্যায় অন্যায়ের বিচার বোধ তার সাময়িকভাবে লোপ পেয়েছিল। এই হল আইনের কথা। আসল ব্যাপার বোঝা গেল দুর্বৃত্ত হোটেলওয়ালার সমুচিত দণ্ড হয়েছে বলে সবাই খুশি। আর এই সমবেত খুশির জোরে আসামীর মুক্তি। এ-ক্ষেত্রে পাঠকেরও খুশি হবার কথা। কিন্তু এইভাবে আইনের ফাঁকে যদি 'ধর্মের জয়' ঘটে তাহলে তার ফল সব সময়ে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নাও হতে পারে।

আসল কথা—এই উপন্যাসের বিচারকের ভাষায়—খুনের বিচার এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এই যে নানা মানুষ, আসামী, উকিল, জুরর ও দর্শকবৃন্দ, এদের সকলের নানা চিন্তা, নানা আশা আকাঙ্ক্ষার টানাপোড়েন এই নিয়ে জমে ওঠে খুনের বিচারের বিচিত্র রোমাঞ্চকর নাটক। এর তুলনীয় নাটক পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে না।

আলোচ্য বইটি উপন্যাস—নাটক নয়। কিন্তু ঐ জাতীয় এক নাটক এই উপন্যাসের উপজীব্য।

হিরণকুমার সান্যাল

নারীর উক্তি—ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী। বিশ্বভারতী। মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

সাহিত্য প্রসঙ্গে সমর্সেট মমের একটি উক্তি বিশেষ দ্রষ্টব্য। তাঁর মতে কাব্য-সাহিত্যের আয়ু দু-চার শো বছর কিংবা তার চাইতেও অনেক বেশি। আর গদ্যের আয়ু বড় জোর দুই পুরুষ, অর্থাৎ ত্রিশ চল্লিশ বছর। তরুণ বয়সে আমরা যে সব গদ্য রচনা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, এখন আর তার তেমন আদর নেই। কারণ কাব্য চিরন্তন উপকরণ দিয়ে রচিত আর গদ্যের সামগ্রী পার্থিব, দুদিন বাদেই সেকেলে হয়ে যায়; সমাজ তাকে অতিক্রম করে যায়; তার প্রাসঙ্গিক মূল্য কিছুই থাকে না।

কথাটা অনেকখানি সত্য। উপন্যাসই হোক কিংবা ছোট গল্পই হোক, সাধারণতঃ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকায় তা লেখা হয় কিংবা সমকালীন জীবনযাত্রার ধারাকে তা' বড় বেশি অবলম্বন করে থাকে। দৃষ্টিভঙ্গের বিষয় আজ যা অভিনব ও চমকপ্রদ, কাল তাতে বর্জনের ছাপ পড়ে যায়। ঘটনা ও পরিবেশকে অতিক্রম করে যেতে না পারলে আংশিক অমরত্বও দাবী করা যায় না। গদ্যের মধ্যে যেটুকু কাব্যধর্মী, শুধু সেটুকুর আদর থেকে যায়। এই শ্রেণীতে উৎকৃষ্ট শিশুসাহিত্য ও রসরচনা পড়ে বলে তারাও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু হয়। কোনো কোনো উপন্যাসও এই কারণে দীর্ঘায়ু; যেমন ইংরেজি বই পিকউইক পেপার্স, কিংবা বাংলায় কমলাকান্ত।

আলোচ্য বইখানি প্রথম ছাপা হয় ১৯২০ সালে, রচনা আরো আগের। শেষ অংশটুকু পরে সংযোজিত হয়েছে, কিন্তু তাও ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে লিখিত। উপরন্তু এগুলি গল্প নয় নিছক প্রবন্ধ; এবং বিষয়বস্তুগুলির উল্লেখ করলেই, সমালোচনার অসুবিধেটা যে কোথায় তা প্রকাশ পাবে। যথা : (১) বর্তমান স্ত্রী শিক্ষা-বিচার (২) সম্বন্ধ (৩) আদর্শ (৪) ভদ্রতা (৫) প্যাটের বিল (৬) বঙ্গনারী, কি ছিল, কঃ পন্থা।

লেখিকা তৎকালীন বঙ্গসমাজের আধুনিকতমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করতে

পারতেন। এবং বর্তমান বঙ্গসমাজের আধুনিকাদের সামনেও আদর্শ নারীর আসনের যোগ্যা। দুঃখের বিষয় গভীর বিদ্যাবুদ্ধি ও আজীবন সাধনা দিয়ে লেখা এই সুবিবেচিত প্রবন্ধগুলির অর্ধেকের প্রয়োগের স্থল খুঁজে পাওয়া এখন দায় হয়ে ওঠে। বাকি তিনটি চিরন্তন বিষয় নিয়ে লেখা, যেমন, আদর্শ, সম্বন্ধ ও ভদ্রতা। বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানে স্থানে এর মধ্যেও অপ্রাসঙ্গিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

তার কারণ শুধু যে সাঁকোর তলা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে তা নয়, বিশেষ করে বাংলা দেশের ওপর একটি মহাযুদ্ধ, স্বাধীনতা লাভ ও দেশ বিভাগ তাদের রথের চাকার দাগ ফেলে গেছে। দশ বছরের মধ্যে পঞ্চাশ বছরের কাজ হয়েছে। লেখিকা যে সমাজের কথা বলেছেন, অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তা উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের কথা, তার মেঝেও খসে গেছে, ছাদও উড়ে গেছে।

সামাজিক জীবনের যে নিশ্চয়তার ভিত্তি তিনি ধরে নিয়েছেন, সে আর নেই। স্ত্রী-শিক্ষা বিচারের কথা বলতে গিয়ে বলছেন মেয়েদের পরীক্ষা না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়; আজকাল পরীক্ষার শীলমোহর কপালে দেওয়া না থাকলে মেয়েদের কেউ কাজ দিতে চায় না।

বলছেন শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে, সেকালের মেয়েদের, অর্থাৎ ঐ মেয়েদের প্রায় অশিক্ষিত দিদিমা ঠাকুমাদের যে স্বাস্থ্য ও ফূর্তি ছিল, সে আর এখন দেখা যায় না। কিন্তু সুখের বিষয় বিয়ের-আশায় বসে-থাকা, কর্মহীন শিক্ষিত মেয়ের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। তারা আজকাল চাকরি করে, কিংবা সমাজ-সেবার ভার নেয়।

বলছেন 'বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে দেশের সহিত যথেষ্ট যোগ রাখা হয় না, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এবং স্ত্রী শিক্ষার অনেক নিন্দার মূল কারণ।'—আজকাল আমাদের সরকার পর্ষদ বসিয়ে, নিজেই দেশের উপযুক্ত করে শিক্ষার ছাঁচ তৈরি করছেন, যাতে সবাই দেশের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে। অনেকে বিদেশী ভাষা শেখা পর্যন্ত তুলে দেবার তালে আছেন।

কালের পরিণতির জন্য এখন অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়, এমন আরো উদাহরণ দেওয়া যায়, যেমন মেয়েদের বেশভূষা নিয়ে সমস্যা। আমরা স্বাধীন হয়ে যে দিশী বেশভূষার আদর করতে শিখেছি সে বিষয় সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রে ঠাকুর পরিবার এবং লেখিকা নিজেও আজীবন যে স্বাদেশিকতার উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন, এতদিনে সে বিষয় শিক্ষিত সমাজের চোখ ফুটেছে। অবশ্য উগ্র বিলিতিয়ানা যে এখনো দেখা যায় না, এমন নয়।

এই সব চিন্তাশীল প্রবন্ধের মধ্যেও লেখিকার সুপরিচিত রসবোধ আর ভাষার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। স্ত্রীশিক্ষার প্রবন্ধের শেষে বলছেন, 'পরিশেষে বক্তব্য এই যে, একেলে পুরুষরা একেলে মেয়েদের যতই দোষ ধরুন, তাঁহাদের বর্তমান সহধর্মিণীর পরিবর্তে যদি তাঁহাদের স্বর্গগত ঠাকুরমা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে সত্যই কি তাঁহারা সন্তুষ্ট হন?'

এমন প্রাঞ্জল, পরিপাটি, মনোহর ভাষা অনুকরণের উপযুক্ত। আদর্শের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, 'আমরা চাই—যতই অন্ধ ও দুর্বলভাবে হউক না কেন, তবুও আমরা চাই যে, যাহা সত্য তাহাই ধরি, যাহা ভালো তাহাই করি, যাহা সুন্দর তাহাই করি।'

ভদ্রতার বিষয় বলছেন, 'ভদ্রতা আত্মীয়তার চেয়ে কিছু কম, এবং সামাজিকতার চেয়ে কিছু বেশি। আত্মীয়তা আন্তরিক, সামাজিকতা আনুষ্ঠানিক। ভদ্রতা উভয়ের মধ্যে সেতু-স্বরূপ, এবং উভচর।...ভদ্রতার মূলে পরহিতৈষণা এবং তার ফুল সংযম।'

আগেই বলেছি বহুদিন পূর্বে রচিত বলে প্রসঙ্গগুলি খানিকটা সেকেলে হয়ে গেছে।

তা হতে পারে, কিন্তু লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গী আগাগোড়া অতি প্রাণবন্ত ও আধুনিক। কুড়ি পঁচিশ বছর আগেও তিনি প্রগতির জয়গান গেয়েছেন, বিপদের কথাও বলেছেন; এখনো তিনি আধুনিকাদের মধ্যে আধুনিকতমা। বইখানির প্রায় শেষে পৌঁছে বলছেন, 'সেকালের বঙ্গরমণীর এক রেখাচিত্র আমি কল্পনা করেছি—শ্রী যাঁদের সম্পদ, হ্রী যাঁদের ভূষণ, ধী যাঁদের সহায়, স্নেহ যাঁদের অগাধ, ক্ষমা যাঁদের অপার, ধৈর্য যাঁদের অসীম; কর্ম যাঁদের বন্ধু, ধর্ম যাঁদের রক্ষক; মন যাঁদের সরল, বাক্য যাঁদের মধুর, সেবা যাঁদের অক্লান্ত; যাঁরা আত্মসুখে উদাসীন, পরদুঃখে কাতর, অতি অল্পে সন্তুষ্ট।'

অনাগত ভবিষ্যতের আধুনিকতমা নারী এর চাইতে উচ্চ আর কোন আদর্শ খুঁজে পাবেন?

লীলা মজুমদার

প্রেমতারা—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২। মূল্য চার টাকা।

এতটুকু আশা—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য। করুণা প্রকাশনী। কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

মানুষের দেহের আলম্ব মেরুদণ্ড, সাহিত্যিকের মেরুদণ্ড তাঁর প্রত্যয়। প্রত্যয়ের রক্তরসে সাহিত্যের জীবনকণা সৃজিত, তারপর অভিজ্ঞতার সাধনবেগে তার পরিপূর্ণ প্রস্ফুটন। অভিজ্ঞতারও আবার নিজস্ব ইতিহাস আছে। মানুষের জীবন জিজ্ঞাসাময়, নিজের পরিচিত পরিধির মধ্যে সেই জিজ্ঞাসার উত্তর সে সন্ধান করে। জিজ্ঞাসা ও সমাধানের সূত্রে যে অভিজ্ঞতার সঞ্চার, তার সত্যের সঙ্গে যখন অন্তরের প্রত্যয়ের ঐক্যবর্মিতা, তখনই জ্ঞানের মূর্তি আত্মপ্রকাশ করে। তাই সাহিত্যের বিচারকালে সাহিত্যস্রষ্টার প্রত্যয়, সেই প্রত্যয়ের সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতার ঐক্য ও সাহিত্যিকের জ্ঞানের রূপরেখা নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়।

উপন্যাসের বিচারে এই সাধারণ প্রত্যয় ও অভিজ্ঞতার প্রশ্ন ছাড়া মহিলা সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ প্রশ্ন ওঠে। মহিলা হলেও কি তাঁদের সৃষ্টিকে সাধারণ মানদণ্ডে বিচার করতে হবে? না কি তাঁদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্যতর দৃষ্টিকোণের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়? পুরুষের রচনার মধ্যে আমরা যা প্রত্যাশা করি, মহিলাদের রচনায় কি আমাদের প্রত্যাশা তা নয়? এর উত্তরে বলতে চাই, বলিষ্ঠ নীতি হিসেবে পুরুষ ও মহিলাদের সাহিত্যসৃষ্টিতে পৃথক মানদণ্ডের প্রয়োগ অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের সমাজব্যবস্থায় যতদিন নারী-পুরুষের জীবনচর্যা ও বাস্তব অবস্থার পার্থক্য থাকবে, ততদিন আপন সামাজিক চরিত্রে, জীবনের উপভোগ ও উপলব্ধিতে এবং অস্তিত্বের গভীরতর মূল্যায়নে পুরুষ ও নারী সাহিত্যিকদের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। যতদিন না নারী-পুরুষের সমান শুভযোগ ঘটছে, ততদিন মহিলা সাহিত্যিকদেরও একটা স্বতন্ত্র মহল না থেকে পারে না। মহল যেমন আলাদা, তেমনি দৃষ্টি, মনন ও হৃদয়াবেগও আলাদা। সংসারের কোনো কোনো স্থলের সঙ্গে নারীর সম্বন্ধ পুরুষের চেয়ে ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক—তাই তাঁদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে অনেক গোপন ও অবগুণ্ঠিত সত্য। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

আজও ভালোবাসার গল্পই মানুষের সেরা গল্প, কারণ জগতে নরনারীর সম্পর্কের চেয়ে বিস্ময়কর আর কি আছে? কিন্তু এই ভালোবাসাও পুরুষের গল্পে যে রূপ ও রঙ নেয়, মেয়ের গল্পে তা না-ও নিতে পারে। ভালোবাসার এক পক্ষ মেয়েদের মন লেখিকাদের হাতে পূর্ণতর চেহারায় ধরা দেওয়ার সম্ভাবনা। তাই মহিলা সাহিত্যিকের যেমন নতুন কিছু বলবার আছে, তেমনি নতুন মেজাজ নতুন মর্জি প্রকাশের সুযোগ আছে।

লেখিকাদের সুর-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করি বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হয় তাঁদের অধিকারের সীমা। পুরুষের কর্মক্ষেত্র উদার উন্মুক্ত বিশ্ব, কিন্তু নারীর মন পোষা পাখির মতো একটা নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে তাঁদের যোগ ক্ষীণ, তাই তাঁদের চিন্তার দৌড় সীমায়িত, অভিজ্ঞতাও নিকটশ্রয়ী। কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কি? আসল কথা, জানার পরিধি বিস্তারের ওপর সাহিত্যের সার্থকতা নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে যেটুকু জানা তার বিষয়ে প্রবুদ্ধির ওপর। বিষয়প্রবুদ্ধি সাহিত্যিক সিদ্ধির চাবিকাঠি।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য নতুন ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখার গতি আশা ও আশঙ্কা দুই-ই জাগিয়ে তোলে। সাহিত্যকে পেশা হিসেবে নেওয়া বাঙলা দেশের নারীর পক্ষে নতুন ঘটনা—তাই আশার কথা, কিন্তু তাঁর কলম চলেছে অতি দ্রুত—এটা আশঙ্কার কথা। বেশি দ্রুত চললে ঘাটের বদলে আঘাটায় পৌঁছোবার ভয় থেকে যায়, সাহিত্যিক সিদ্ধি বিচলিত হতে পারে।

"প্রেমতারা" সার্কাসের কাহিনী। জন্তু নিয়ে নিত্য মরণের খেলা যারা খেলে, এ তাদেরই উপাখ্যান—তাদের জান্তব প্রকৃতির রূপচিত্র। কিন্তু তারাও মানুষ। তাই সার্কাসের নরনারীর মনেও ঘর বাঁধার স্বপ্ন জাগে, বিয়ের নামে ছেলেখেলা হয়, আবার ঘর ভাঙে। উন্মুক্ত পৃথিবীর সামাজিক মানুষের সমস্যা ও সার্কাসের নরনারীর সমস্যা এক নয়। যে সমস্ত গভীরতর কারণে পরস্পরের সম্পর্ক ভাঙে গড়ে, যে সব কার্যকারণ শৃঙ্খলা সুখদুঃখের বিচিত্র অনুভূতিতে মানুষের জীবনকে সজীব করে রাখে এবং নিজের সঙ্গে অপরের কিংবা বিশ্বের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করে, সার্কাসের মেয়েপুরুষের ক্ষেত্রে তার চেহারা আলাদা, স্বাদ আলাদা—তার বোধ, পরিধি ও দর্শন মননশীল বিচারপ্রবণ সহৃদয় বিশ্লেষণের দাবি রাখে। মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য কৌতূহলী দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন সার্কাস মণ্ডপের আনাচে-কানাচে, মানুষগুলির জীবনের অভ্যন্তরে, তাদের মনের বসতিতে। কিন্তু লেখিকার দৃষ্টিপাত শুধু সার্কাসের নরনারীর প্রাথমিক চিত্তবৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে, 'অরণ্যের চেয়ে অনেক আদিম এক প্রথম অনুভূতির' ঘূর্ণিতেই আবর্তিত হয়েছে, গভীরতার বোধ ও বুদ্ধির জগৎ আবিষ্কার করতে পারেনি। তাই তিনি বাঘিনী কন্যার দুরন্ত পিপাসা ও উষ্ণ ভালোবাসার কথা, বিগতযৌবন গোপীনাথের আরণ্যক যৌবনজ্বালার কথা শুনিয়েছেন—প্রেমতারার দেহ গেছে, কিন্তু মন নষ্ট হয়নি—এ আভাসও দিতে ভোলেননি; তবু মনে হয়, সবটুকু যেন বলা হলো না। সার্কাসের মেয়েপুরুষের সজল মানবীয়তার বাইরেও যেন কিছু রয়ে গেলো, মনোহর ও প্রেমতারার উত্তপ্ত সান্নিধ্য দেখে খাঁচার ভেতরে দুটো পিঙ্গল কপিশ চোখের জ্বলে ওঠাই পুরো সত্য নয়। অবশ্য চাকুরী-হারানো বোতল-সর্বস্ব লালাবাবুর আর্তনাদ একটা নতুন সুর—সার্কাসের মানুষ সম্পর্কে গভীরতর চিন্তনের ফল। কিন্তু তারও যেন শেষ রক্ষা হলো না, বোম্বের গ্রাণ্ট রোডে ভাঙা লোহা-লক্কড়ের দোকানের সচ্ছলতায় লালাবাবু বেঁচে উঠলেন বটে, কিন্তু লেখিকার

অন্তর্মুখী দৃষ্টির মৃত্যুর মূল্যে। জীবনের সমস্যা যদি এত সহজেই মিটে যেতো তবে সংসারটা এত জটিল ও কঠিন হতো না—যদি মিটেও যায় তবু তার কার্যকারণের অনিবার্যতা ব্যাখ্যা করা চাই।

আসল কথা, 'টেস্'-এর ভূমিকায় হার্ডি যা-ই বলুন না কেন, উপন্যাস শুধুই 'impression' নয়, তা 'argument'-ও বটে। মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে প্রথমটার সুন্দর পরিচয় আছে, কিন্তু দ্বিতীয়টার অভাবও আছে। জীবন সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয় হচ্ছে—তিনি মানবীয়তায় আস্থাবান, মানুষের সুখ-দুঃখের রসসম্ভাবনার ভোক্তা। কিন্তু এতেই, এই চিরায়ত বোধেই সাহিত্যিকের পুরো প্রত্যয় গড়ে উঠতে পারে না, তার সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দর্শনের যোগ হওয়া উচিত। "প্রেমতারায়" বিনোদবালা এই দিক থেকে সার্থক—হয়তো যৌবনকে হারিয়ে সার্কাসের মানুষগুলিকে একটু দূরে থেকে বিচার করার অধিকার সে পেয়েছে, একটা আশ্চর্য স্বচ্ছ দৃষ্টি তার মধ্যে এসেছে।

"প্রেমতারার" বিষয়বস্তু সাধারণ নারীর অধিকারের বাইরে এবং জ্ঞানের অনায়ত্তও বটে। এ-ব্যাপারে মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য দুঃসাহসী, নিজের সমাজের অধিকারের সীমা-সঙ্কোচনে তাঁর বিশ্বাস নেই। সার্কাস সম্বন্ধে তাঁর একটা মোটামুটি ধারণা আছে—তাই কয়েকটি মোটা রেখায় সার্কাসের রূপাবয়ব ফোটাতে পেরেছেন। তবে অজানা বিষয়ের প্রতি পাঠকমাত্রেরই সহজাত কৌতূহল চরিতার্থ হওয়ার মতো সূক্ষ্ম আঁচড় এতে নেই, নেই চরিত্রগুলির বিশেষ বিশেষ মানসিক আবহাওয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। কিন্তু প্রেম-অভিযানে নায়িকার দুঃসাহসিকতায় আমরা চমৎকৃত হই। নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠায়, বিশেষ করে প্রেমের ক্ষেত্রে, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের অস্ত্র passion, যুক্তির শর নয়, সনাতন নীতিবোধ নয়।

"প্রেমতারা" সুখপাঠ্য, মোটামুটি স্বচ্ছন্দ রচনা—কিন্তু "এতটুকু আশা" অপটু হাতের সৃষ্টি। মানুষমাত্রেই স্বপ্ন দেখে, আশা পোষণ করে—মোটর-মিস্ত্রী বলাইও স্বপ্ন দেখেছিলো—একটি বেবি ট্যাক্সির। সুধীর মণ্ডলের অর্থসাহায্যে সে-আশা সফল হলো, কিন্তু সুধীরের অর্থগৃধ্নু দৃষ্টি স্বস্তি দেয়নি বলাইকে। তাই বিবাদের মেঘ জমলো, গুরুগুরু ধ্বনিও শোনা গেলো, কিন্তু ঝড় শুরু হওয়ার আগেই বাজীর আগুনে ছাই হয়ে গেলো সুধীরের কারখানা। সর্বনাশ চোখের জলে দুজনকে এক করে দিলো—মধুর পুনর্মিলন। এ-কাহিনীতেও বিষয়-নির্বাচনে মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের সাহসের পরিচয় আছে, কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতার পসরা অপেক্ষাকৃত ন্যূন। বলাইয়ের স্বপ্নের চিত্তাকর্ষকতা ও ভোমরার শান্ত মাধুর্য ছাড়া উপন্যাসটিতে মোটর-কেন্দ্রিক জীবনের আর কোনো স্বাদ বা সৌরভ নেই। দুশ্চরিত্রেরও একটা চরিত্র থাকে—সুধীরের তা-ও নেই। বিজলীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা লেখিকার কলমে তীব্র ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। একটা যত্নের অভাব ও পারিপাট্যের ত্রুটি অনেক জায়গায় পরিস্ফুট, এমনকি ভাষায়ও।

বই দুখানি থেকে বোঝা যায়, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য গল্প বলতে জানেন, চিত্রও আঁকতে পারেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের পরে জন্মগ্রহণ করে এই গুণগুলোর ওপরই নির্ভর করলে তাঁর চলবে না, আরও কিছু চাই।

জীবেন্দ্র সিংহরায়

প্রণয়ী পঞ্চক— সুশীল রায়। নতুন প্রকাশক। কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·৫০ ন.প.।

বাংলা লিরিক কবিতার এই পরিণত মুহূর্তে, গীতিকবিতার আঙ্গিক সংহতি এবং ক্রম-হ্রস্বীকরণের পর্বে "প্রণয়ী পঞ্চক" কিছুটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। আপাতদৃষ্টিতে একই বিস্ময় উদ্রেক করবে না হয়ত, কারণ তার কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে মহাভারত থেকে। কিন্তু আখ্যায়িকা কাব্যের কাহিনী-চয়ন পরবর্তী অধ্যায়ে গিয়ে যে বর্তমান-জীবন অভিলাষী হবে তা অনুমান করে উৎসাহিত বোধ করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

মহাভারত আমাদের সমগ্র জাতির অখণ্ড আত্মজীবনী। অসংখ্য ছোটগল্পের উপকরণে রচিত একটি কাব্যনাট্যধর্মী বিশাল উপন্যাস বিশেষ। কর্ম, ভাব ও ধর্মজীবনের এই পূর্ণাঙ্গ সংকলনটির অগণিত চরিত্রের মধ্যে একটি সর্বকালীন আবেদন বর্তমান। মহাকাব্যের সেই বিশাল অরণ্যের মধ্য থেকে শ্রীযুক্ত সুশীল রায় পাঁচটি শাখাকাহিনী বেছে নিয়েছেন যার মধ্যে নরনারীর চিরকালীন হৃদয়ার্তির সান্ত্বনা বিদ্যমান এবং শিল্পরসের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে, আদ্যন্ত বিশিষ্ট সেই সব কাহিনীর মধ্যে হৃদয়ের যে জটিল ছায়ার প্রতিফলন তিনি ঘটিয়েছেন তা একালের। যে পঞ্চনায়িকার জীবন কথাকে তিনি আখ্যায়িকার উপজীব্য করেছেন তাঁরা বিচিত্র চরিত্রের অধিকারিণী। কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে, মহতী আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের সংঘর্ষের ফলে, তাঁদের যে দ্বিতীয় জন্মের ইতিহাস এই গ্রন্থের কাব্যবস্তু তা সত্যিই বিস্ময়কর। পৌরাণিক তথ্যনিষ্ঠা বজায় রেখে, তৎকালীন জীবনকথাবহ স্পন্দিত করে, হৃদয়ের, প্রেমস্বরূপের যে আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা রসোজ্জ্বল হয়েছে। নিসর্গসঞ্চারী দৃশ্যরচনায়, সর্গবন্ধনে, ঘটনার স্বতশ্চলনে, চারিত্র্যোচিত্যে এবং মহাকাব্যানুরূপ নির্লিপ্ত ও সংহতি বজায় রাখায় বর্তমান কবি প্রায়শঃই আখ্যায়িকাকাব্যের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হননি।

ধ্রুপদী সাহিত্যে কবির সমবেদনা পর্যন্ত আমরা অগ্রসর হতে প্রস্তুত কিন্তু লিরিক কবিতায় কবির আত্মবিলাপ ও স্ববেদনা সমুত্তীর্ণ, প্রণয়ীপঞ্চকে এতদুভয়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে। নায়িকা চরিত্রচিত্রণে উদাত্ততা ও সংবেদনা রেনেসাঁসের প্রথম কবি মধুসূদনের অবদান, বর্তমান পাঁচটি প্রণয়কথাও নায়িকাবৃত্তক এটি লক্ষণীয়। নারীর বহিরঙ্গরূপ বর্ণনায় সুশীলবাবুর মার্জিত বাক্‌ভঙ্গী এবং শ্লীলরুচির পরিচয় আছে।

কিন্তু "প্রণয়ী পঞ্চকে"র নাটকীয়তা সময়ে সময়ে আখ্যায়িকাকাব্যের সংস্কারে ঘা দিয়েছে। সাহিত্যের কোন স্থিতবিন্দু সংজ্ঞা নেই একথা মনে রেখেও বলতে হয় প্রণয়িনী মাধবীর কাহিনীতে এসে তিনি স্পষ্টতঃই আখ্যায়িকা-ধর্ম থেকে স্খলিত হয়েছেন, এই ব্যতিক্রম সত্ত্বে যদিও মাধবীই আমাদের আধুনিক ছোটগল্প পাঠকের চিত্ত জয় করে নেবে তার সমস্যা এবং চরিত্রের অভিনবত্বে, উত্তমপুরুষে ভাষণে ও উপস্থাপনের ভঙ্গীতে। প্রণয়িনী সুলভা-র কবির স্বগতোক্তি প্রসূত গৌরচন্দ্রিকাটি সংযত হলেও আখ্যায়িকাকাব্যের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করেছে বলে মনে করি। সর্বাপেক্ষা পরিচিত কাহিনী প্রণয়িনী উর্বশীর প্রথম দুটি সর্গ চেষ্টাকৃত রচনা বলে মনে হয়েছে, স্বতঃস্ফূর্তির অভাব এবং সেইসঙ্গে মাইকেলী অনুশীলন কবির সাময়িক দুর্বলতার আভাস দেয়। কিন্তু পরবর্তী সর্গগুলিতে তিনি তাঁর স্বতন্ত্রতা এবং নৈপুণ্য ফিরে পেয়েছেন।

উপাখ্যানগুলির কাহিনী বর্ণনার মধ্যে কবির রসচেতনা আদ্যন্ত প্রবাহিত, সচেতন শব্দপ্রয়োগের মধ্যে তার অর্থমগ্ন নিদর্শন রয়েছে। স্বর্গ রয়ে গেল স্বর্গে? | ৫৪ পৃঃ, স্বর্গই কামনা যার নিসর্গে কী সুখ তার | ৬২ পৃঃ, হরের ভার্যা তুমি কি হরিণী | ৬৭ পৃঃ,

বৈকুণ্ঠে এনো না কুণ্ঠা | ১৭৮ পৃঃ, থোঁপার ফুলের গন্ধে ভাঙে ভ্রমরের কাঁচা ঘুম | ১৬৯ পৃঃ, ...আজিকার এ-পদস্খলন | তোমাদের কাছে দুটি আমার পরম প্রয়োজন | ১৬১ পৃঃ এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে শেষোক্ত দুটিতে কাঁচা ঘুম এবং পদস্খলন শব্দদুটি উপভোগ করবার মত।

নাটচেতনা এই আখ্যায়িকাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য। কাহিনীকে বিভিন্ন লয়ের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে যেতে একটি উচ্চচূড় নাটকীয় মুহূর্তে উত্তীর্ণ করে দিতে এবং প্রতিটি ঘটনার যথার্থ আবহ সৃষ্টিতে তিনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত করতে গিয়েও বাস্তবচেতনাকে হারিয়ে ফেলেননি। তাই উর্বশীর নৃত্যপ্রদর্শনকালের বর্ণনায় এমন একটু উল্লেখও দেখতে পাই—পাদপ্রদীপের আলো | চোখে পড়ে দৃষ্টি মত খণ্ডিত হোক না উর্বশীর | ১৬০। পরারের মধ্যে যতিপাতের বৈচিত্র্য এনে আকস্মিকতা ফুটিয়েছেন সুন্দর—সহসা স্তম্ভিত হয় আনন্দ-উৎসব। যবনিকা | নেমে আসে অবিলম্বে। নেভে পাদপ্রদীপের শিখা | ১৬৬। আবহসঞ্চারী বর্ণনার মধ্যেও নাট্যরস জন্মেছে বহুস্থানে :

রাত্রি কাটে ধীরে ধীরে। স্তিমিত প্রদীপ নিভে আসে,
তপোবন-বৃক্ষশাখা কেঁপে ওঠে নিশার বাতাসে,
দীর্ঘনিশ্বাসের মত মনে হয় পত্রের স্বনন,
রভসে কাটায় রাত্রি সংগোপনে তারা দুইজন॥

এই সংগোপন কথাটার ব্যবহারের মধ্যে বর্তমান উপসংহারের তির্যকনৈপুণ্য সংযতমূর্তিতে প্রকাশ পেয়েছে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে আমাদের, আখ্যায়িকাকাব্যে কিংবা মহাকাব্যের মধ্যে বহু নিকষপংক্তি থাকলেও তাদের খণ্ডিত উদ্ধৃতি রসহানি ঘটায়। গীতিকবিতায়, অন্তত আধুনিক কবিতায়, ফলশ্রুতি-গামিতার চেয়ে এক একটি পংক্তির আকস্মিক উজ্জ্বল বিস্ফার আমাদের মনকে লুব্ধ করে। "প্রণয়ী পঞ্চক"-এ আমরা কাহিনীর সঙ্গে প্রবাহিত হতে হতে যে সব মন-নাড়া দেওয়া পঙক্তি খুঁজে পেয়েছি কাব্য-প্রবাহের মধ্যে দুর্নিবন্ধ, সমাবেশরীতির গুণে তারা প্রশংসাযোগ্য।

শব্দ প্রয়োগ ব্যাপারে বর্তমান কবি অত্যন্ত সাবধানী হলেও কয়েকটি জায়গায় শৈথিল্য নজরে পড়ল। তার কিছু উদ্ধৃত করছি :

দোকানে | ১৫৫, মেয়ে নয় স্বর্গীয় আগুনে | ১৫৮, সূক্ষ্ম পাটিকেল | ১৭৪, লিখে নাও নাম | ৬০, ...হে ভাবিনী | এত মনোমুগ্ধকর এত মনোহর, তা ভাবি নি | ১৪২ এই শব্দ প্রয়োগ, বাক্‌ভঙ্গিমা এবং মিলের আপাতচাতুর্য ঔচিত্যহানি ঘটিয়ে লঘু করে দেয় আবহ-মণ্ডল।

নামকরণ সম্বন্ধে পরিশেষে এই বক্তব্য যে প্রণয়ী এবং পঞ্চক এই দুটি শব্দের সমাবেশে নামকরণের মধ্যেকার মহাপ্রাণতা ব্যাহত হয়েছে। বিশেষতঃ ওই দুটি একই বর্ণের সংলগ্ন দ্রুত উচ্চারণে প্রবঞ্চক শব্দের ধ্বন্যাভাস এসে যায় বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রণয়ী কথাটাও চলতি বাংলার সুলভ ব্যবহার দোষে লঘুজীবী। প্রণয়িনী-নির্ভর আখ্যানগুলির প্রণয়ী আখ্যা দেবারও কোন যুক্তি দেখি না। উৎকর্ষ বিচারে রচনা-সূচী এই রকম দাঁড়ায় : সুভ্রা, মাধবী, শ্রুবাবতী, উর্বশী ও সুলভা।

আনন্দ বাগচী

দুর্গোৎসব

সৃষ্টির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে ধ্বনি। সুপ্রাচীন ধর্মশাস্ত্র অথবা ভারতীয় রাগসঙ্গীত—যারই চর্চা আমরা করিনা কেন, নাদব্রহ্মের সত্যতা আমাদের এক নিগূঢ় শক্তির আশ্রয় দান করে। দেবদেবীর আরাধনা ও মন্ত্রের সুগম্ভীর ধ্বনিও মুহূর্তে আমাদের এক অকল্পনীয় ভাবলোকে নিয়ে যায়। সেখানে চরিত্র, বীর্য, মহত্ত্ব ও শান্তি। আগমনী গানের সুরসৃষ্টিতে দেবী দুর্গার আবাহনে সেই ভাবলোকের নিরন্তর শান্তি আজ বাঙ্গালীর জীবনে সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিমিটেড্

আবিষ্কারক : রসোমালাই

কলিকাতা

GRAM : ARTWARES, CALCUTTA PHONE : 23-1543

THE

INDIAN TEXTILES CO., PRIVATE LTD.

Jewellers, Embroidery, Brocade & Silk Manufacturers

GREAT EASTERN HOTEL ARCADE

&

GRAND HOTEL (LOUNGE)

Branches : BOMBAY BANARAS DELHI & MUSSOORIE